প্রকাশনায় :
রীতা কর
সমন্বয় প্রকাশনী
২৭ ডি, হরিতকী বাগান লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রণে :
প্রভাসচন্দ্র অধিকারী
স্বপ্না প্রেস
৩৫/২/১এ বিডন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা, ১৩৬৫

১

অরুণ ভট্টাচার্য
অরুণ মিত্র
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
কৃষ্ণ ধর
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
মনীন্দ্র রায়
রাম বসু
শুদ্ধসত্ত্ব বসু
সিদ্ধেশ্বর সেন
সুশীল রায়
হরপ্রসাদ মিত্র

অরুণ ভট্টাচার্য

একমাত্র তিনি জানেন

১. দুটি নীলকণ্ঠ পাখি রোজ আমার বাগানে এসে বসে।
কাছে যায়, কাছে আসে, এ ওর মুখের দিকে
তাকিয়ে কী যে আদর করে, নিশ্চিন্ত আদর।

এসব ভালোবাসার অর্থ আমি সঠিক বুঝি না,
কিন্তু আমার শরীরে কোথায় কেমন যেন এক
উদ্দাম বাতাস বহে যায়।

২. পাখিরা ঘরে এসো।
আকাশ সীমানাহীন, অথৈ নীলে আর
কতদূর উড়তে চাও।
ঘর বাঁধো, একবার
ডানা গুটিয়ে অনন্ত নক্ষত্রমালার দিকে তাকাও।

৩. একমাত্র তিনি জানেন
কোথায় পথের শুরু কোথায় শেষ।
একমাত্র তিনি জানেন
নারিকেল সুপুরির বনে বর্ষার দুপুরগুলি
কেন এত দীর্ঘতর হয়।   কেন কাকচক্ষু দীঘিজলে
যুবক যুবতীর স্থির ছায়া পড়ে।

অরুণ মিত্র

সাদা ভাত মুঠোয় তুলছি

আমি সাদা ভাত মুঠোয় তুলছি
আর আমার উপর অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ছে
তর্জনগর্জন মাঠ থেকে ছুটে এসে ঘরের মধ্যে
আমি হাত ওঠাচ্ছি ঝড়ে।

আমি ভাবছি ঝিরঝিরে বাতাসটা আমার
পালকগুলো আমার
ঝাউয়ের ঝারি আমের বোল আমার
ভাবতে ভাবতেই আমি ডুবছি চোরা টানে।

আমি ঠোঁটে রাখছি দিলখোলা আওয়াজ
যাতে হাজারটা পাঁজর দোলে
যাতে চোখের ঠুলি খসে
সব স্বচ্ছ কথা তো আমার
আমার পাহাড়ে ময়দানে রাস্তার মোড়ে
তাদের ঠিকরে দেবার জন্যে আমি মুখ খুলছি
আর আমার গলায় বসছে জঙ্গলের নোখ।

সরলতা, তুমি আমাকে নিয়ে কোন্ গহরভিহায় ?

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আয়না

দিনগুলো কিছুতেই শান্ত হতে চায় না।

মেঘ ডাকে, কখনো বিদ্যুৎ গর্জায়,
দাঁতে দাঁত চেপে আক্রান্ত প্রহরগুলোর
অন্ধকারের দিকে যাত্রা।

একেক সময় মনে হয়
সমুদ্র সৈকতের দিকে যাওয়া ভালো ;
কেননা সমুদ্রের ঢেউগুলো
অবাধ স্বাধীনতার সাক্ষী ;
মনে হয় পাহাড়ের দিকে যাওয়া ভালো
কেননা নীলিমা ঘেঁষা পাহাড় চূড়াগুলো
স্মরণ করিয়ে দেয়
মানুষের মাথা উঁচু রেখে এগিয়ে চলার কথা।

নানা গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরে ফিরে এক সময়
সমস্ত স্বাদ কটু, শরীর শীর্ণ,
চোখ মেলেও তাকানো কঠিন।

অথচ চোখ মেলে তাকালেই দেখা যায়
আকাশের স্থির নীলিমার গভীরতায়
প্রবহমান নদীর স্রোতের ধারায়
পাঁচ পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায়
প্রবীণ অশ্বত্থের শাখায় শিকড়ে
জীবনের সম্পূর্ণতার আয়না ।।

কৃষ্ণ ধর

চিরকুট

অনেকক্ষণ সে এসে বসে থেকে থেকে
চলে গেছে শেষে
রেখে গেছে টেবিলে ফুলদানির তলায়
ক্লান্ত অক্ষরে লেখা ছোট্ট চিরকুট :
দেখা হল না, কথা রেখেছি ।

চিরকুটের কথাগুলো আমার ভেতরে
সুগন্ধ ছড়ায় সারাক্ষণ
বুকের ভেতরে ঝরণাজলের শব্দ শুনতে পাই ।
দমকা হাওয়ায় হঠাৎ জানালা দরজাগুলো
হা হা করে ওঠে আমাকে চমকে দিয়ে
হাতের চিরকুটটা উড়ে গিয়ে
মেঝেতে হুটোপুটি খায় বাচ্চা ছেলের মতো ।

এ কার চিরকুট আমি ভাবতে থাকি ?
কার কাছে কথা দেওয়া ছিল তার ?
সে কি আমি ?
কিংবা সে এসে বসেছিল ভুল ঠিকানায়
ভুল মানুষের জন্তে বসে থেকে থেকে
চলে গেছে একা !

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশ্চিহ্ন

হয়তো কিছু ভুল ছিলো বা ঠিকে !
এই কথাটি বলতে করবীকে—
'অনেক দিনের পারের সে এক দিন
হাল্কা যেন পালক, বন্ধাহীন—
হাওয়ায় ভেসে চলে
আকাশে আর জলে ।
সে-দিনখানি এবার যদি ফেরাই তোমার দিকে ?'
সে বললো—'বেশ, কবিতা দাও লিখে ।
স্বাদটা থাকুক চির-নবীন...
ডিঙিয়ে সমকালের বেড়া
যাক্ সে চিরদিনের পাড়া
কোনোদিন আর হয়না যেন ফিকে ।'

এই না ভেবে চেষ্টা ক'রে
কবিতা-রূপ কৌটো ভ'রে
রাখছি সে-দিনটিকে—
এমন সময় গতদিনের হাওয়ায়
পিছন ফিরে চাওয়ায়
ভাবনাগুলো ছুট দিলো যে
বহুদিনের দিকে ।
শেষটা সেদিন হারিয়ে গেলো
দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেলো
চেনার পরিধিকে ।
হাজার দিনের ভিড়েই গিয়ে ভিড়ে
অভিজ্ঞানটি হারালো সে অচেনাদের নীড়ে ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজায় রাজত্ব করে

নিলামে চড়িয়ে আত্মা তারা
হতে চায় মুশকিল-আসান ;
তাদের মুখে প্রেমের খই ফোটে
বুকে বিসর্জনের ভাসান।

কেমন সে বিসর্জন, নদী
যদি জানে শুধুই পাষাণ ?

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ষাট বছরের

ষাট বছরের সিঁড়ি ভেঙে উঠে হঠাৎ একলা ছাদের আমি
হারিয়ে যাওয়ার মুখোমুখি যেন রবি ঠাকুরের বালিকা বামি,
এবার রইল ঘনান্ধকার তারা-ফুটফুট হাসিতে চেয়ে :
দুঃখ কেবল হানবে না কেউ কটাক্ষ লাজবন্তী মেয়ে।

ছেলেবেলা ছিল বাসনা মনের মগডালে উঠে দুনিয়া দেখা,
যৌবনে মনগড়া দুনিয়ায় নিজেকে ভেবেছি একক, একা,
আজ শূন্যের চোখে চোখ এক-আকাশ তারায় হয়েছি কানা
দুঃখ কেবল জানবে না কেউ স্বপ্নের নেই বয়স-মানা।

হয়ে যৌবনে সওয়ার ছুটেছি চমকে দমকে রঙে ও রূপে,
পেশীপারুষ্য জয়রোমাঞ্চ এঁকে রেখে গেল এ-দেহকূপে,
আজ সবই স্মৃতি, তবু স্মৃতি এক সময়ওড়ানো বিস্ফোরণই :
দুঃখ কেবল মানবে না কেউ যৌবন দেহদীর্ণ মনই।

মণীন্দ্র রায়

জল পাবে

ভেবেছিলে ঢেউ আছে,
নৌকো আছে, সমুদ্রের দিকে
ভেসে যাওয়া, তাও।
এখন বালিতে হেঁটে
দিন যায়, মরা সোঁতা,
সমুদ্র উধাও।

তবুও সময় হলে
আঙুলে আঙুলে খুঁড়ো বালি।
হয়তো-বা জল পাবে, হয়তো সেখানে
আকাশও দেখবে একফালি।

রাম বসু

নির্মাণের নিজস্ব নিয়মে

হতে পারে
এখন সবই হতে পারে
কচ্ছপের পেটের অন্ধকারে
মালিকের বাতানুকূল ঘরে
মন্ত্রীর কামরায়, রোটাণ্ডায়
পার্টির বিবরে, ইউনিয়নের হল্লায়
নেতাদের ভানুমতী খেল-এ
বারে, মাঠে, গঙ্গার ধারে, অঢেল বস্তিতে, যায়
গলির মুখে নরহরির চায়ের খুপরিতে
হতে পারে, সবই হতে পারে

সবই হতে পারে নবতরঙ্গ সিনেমায়
এ্যাণ্টি ড্রামা নাটকে, গবেষণার জমিদারীতে
দৈনিকের সাপ্তাহিকের রমরমা শুঁড়িখানায়
ইয়োরোপের চিবানো ডাঁটার ছিবড়ে
ভীমবেগে চিবানোর মরীয়া উত্তমে
অর্থাৎ আমাদের চালাক আধুনিকতায়
বিপ্লবের ঘাই মেরে এক ডুবে উঠে পড়া সিয়ার বাহুতে
হতে পারে
ষাট কোটি জড়পিণ্ডের বিস্ফারিত চোখের সামনে
সবই হতে পারে

তবে বৎস আর দেরি কেন
পথে এস, ভিড়ে পড়

কোন কোন তালকানা থাকে যার সব পথ
নির্ঘাৎ বিপথ
ভিড়ে পড়তে দেখে সেখানেও ভিড়ের বিপদ
চলতে গিয়ে দেখে পা দুটো টানছে পাতালে
গাছের শিকড়গুলো আকাশের দিকে ঠ্যাং তুলে
তুড়ি মেরে হাঁই তুলে যায়
সময়ের তাতে পিঠ ঝলসে গেলেও হুঁস নেই তার

না শহর, না গ্রাম, না মানুষ, না আকাশ
কিছুই হানে না আর
গাছের ছায়ায় শুয়ে নিজের মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা
—তারও উপায় নেই ; কারণ
আমার একটা মন কখন যে হাজার শরিকে ভাগ হয়ে
এ ওর টুঁটি কামড়ে আছে, জানতেই পারি নি
জানলাম যখন দেখলাম
আমার সমস্ত পথ নির্ঘাৎ বিপথ

যখন হতে পারে, সব হতে পারে
বাট কোটির সমৃদ্ধ রৌরবে

সবই যখন হতে পারে তখন
কিছু না হতেও তো পারে
দুঃস্বপ্ন যখন দেখি তখন
স্বপ্ন দেখতেও তো পারি
জী হুজুর যখন বলতে পারি তখন
বলতেও পারি না হুজুর
পলে পলে মরতে পারি যখন নেশার ঘোরে অভ্যাসের পাঁকে
তখন তো একবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠতেও তো পারি

পা দুটো যদি পাতালেই টেনে নিয়ে যায়
তবে সেই পাতাল ছেঁচে মুক্তো আনা ভাল
ঢের ভালো অন্ধকারকে আলো করে তোলা

অন্ধকার তাড়ানো নয়
আলো করা
তাড়ালে আবার আসে পোষা কুকুরের মতো ল্যাজ নেড়ে
স্বভাবের ফোকোর থেকে ফোঁস করে কালচ কেউটে
তাড়ানো নয় ;—বদলানো
নিজেকে আগাগোড়া বদলানো আলোর আদলে

সবই যখন হতে পারে
আমি জড়পিণ্ড হতে পারি
আবার হতে পারি আলো

জড়পিণ্ড হওয়া মানে গা ছেড়ে দেওয়া
আলো হওয়া মানে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা
অর্থাৎ নিজেকে স্থাপন করা, হয়ে ওঠা
মননে আবেগে শক্তির নাচনে হওয়া অমল উল্লাস

হয়ে ওঠা, মানে, গড়া
আনন্দ নির্মাণে

গড়া ?
কিসের আদলে গড়া ?
কোন নক্‌সা, কোন মাপে জোকে ?

গড়া, অপরিমিতের আদলে
বোধের নিয়মে
স্থানে কালে পরিমিত সত্তার ওপর হয়ে ওঠা
অপরিমিত ; শোনা
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে রৌদ্রের সঙ্গীত
লাভার ভেতর থেকে মগ্ন কণ্ঠস্বর
খনি থেকে লাফ দেওয়া হলকার আনন্দ
শুধু তাকে মুখ দেওয়া
শুধু তাকে চোখ দেওয়া
শুধু দেওয়া সুঠাম শরীর

দিতে গিয়ে সচেতন বিনয়ী প্রয়াসে
নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া
নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া, মানে, নিজেকে বদলে ফেলা
নির্মাণের নিজস্ব নিয়মে, অমোঘ বিধানে
হয়ে ওঠা চন্দনের ধূপ
বিরোধ মিলনে একটি নিটোল স্তব
চোখের আকাশে সূর্য
ষাট কোটি কবন্ধের হুল্লোড়ে, কান্নায়

নির্মাণের নিজস্ব নিয়মে হতে পারে
হতে পারে, তাই
হতে পারি ।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সেতু

বসন্ত এলেই বুঝি সব আসে,
কচিপাতা, পাখি প্রজাপতি
বিতত বকুল, আর
বিস্ময়-বিহ্বল চোখে দুর্নিবার গতি ?
বসন্ত হাজির হয়, পরিচিত উজ্জ্বল সকালে
জীবনের জীর্ণ দরোজার পাশে
চতুর বিক্রেতা সেজে, আলাপে ও বিজ্ঞাপনে
রঙিন ভেজাল নিয়ে কুসুমের মাসে !

নিকেলের পাখি ওড়ে ; অদ্ভুত সুরেলা টেপে
আশাবরী কলরব তুলে
পাজিতে বসন্ত আসে, ফাল্গুনে ও চৈত্রে
ঘর গেরস্থালি ভরে নামহীন প্লাস্টিকের ফুলে !

বসন্ত এলেই বুঝি সব আসে !
আশা ভালবাসা বিশ্বাসের নদী—
তোমার বুকের থেকে চান্দ্রস্পর্শে
সেতু গড়ে আমার আকাঙ্ক্ষালীন অন্তর অবধি

সিদ্ধেশ্বর সেন

মুহূর্তের চূড়ায়—স্রোতের অবগাহে

এক জীবনে বহুজীবন বাঁচার
স্বপ্ন মানো—স্বপ্নে তনুমন-ও

স্বপ্নে কেন—সত্যে
ক্ষণবাদের ঢেউয়ে যেমন, নদীরও সঞ্চয়ন

একই সে নদী ঢেউয়ে তার অগণ্য

নিয়ত নদী, তোমারও পারাপার
অথবা পারাপারও, হয়তো, নয়
মুহূর্তের চূড়ায়,—স্রোতের অবগাহে

শুধু যাওয়া শুধু আসায় শুধু স্রোতে, ভাসায়

মাঝ নদীতে, ঘাটের কাছে, বিচ্ছিন্নের ঢেউয়ে
মিলেই সেই বিশাল অবগাহ-ই

কোথায় যেন ফসলও ওঠে পেকে

নদীরই দানে, নয়তো, পরিশ্রমী
জলসেচে, খরাপ্রবণ প্রান্তেও
খানিক সবুজের আশা, ভাষায়, বুঝি বীজেরই আত্মদানে

তোমার বাঁচায় আমাকেও কাছে টানে

আমাকেও দিলে জন্ম যেন জন্মান্তরে ধন্য ॥

সুশীল রায়

তৃণ

দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ অন্তহীন আকাশের উদার আশ্রয়ে
কতটুকু স্থান পায় ? তবু সেইটুকুকেই অসামান্য গণি
নক্ষত্রপল্লীতে দেখা দেয় ঠিক নীলকান্তমণি
রেখো এক-ফালি জায়গা তোমার ও বিশাল হৃদয়ে।

সে সামান্য স্থান দিতে কতটুকু ক্ষতি বা তোমার ?
সামান্য তৃণও পাড়ি দিতে পারে বিশাল বিপুল পারাবার
এ আমার যাঞ্চা নয়, এ আমার দৃপ্ত অধিকার।

কলায় কলায় চন্দ্র যায় ক্ষয়ে-ক্ষয়ে
সে জন্যে কি চন্দ্রের উদয়ে
আমরা আক্ষেপ করব ? আমাদের প্রাণ
চিরদিবসের জন্যে রেখে যাব অক্ষয় অম্লান।
ওরা যারা হৃদয়ের অনুরূপ কথাই না-পায়
সেই তো দ্বারস্থ হয়ে অনুকম্পা চায়।

হরপ্রসাদ মিত্র

অবিস্মরণ

যদি কিছু চেয়ে থাকো, পেয়ে থাকো,—ভুলেও গেছ তা।
মানে, যে বল্লমটার খোঁচা লেগেছিল, তার ফলে—
ঘটেছিল রক্তপাত, ক্ষতটাও ছিল কিছুদিন,
কালের চিকিৎসাগুণে ঘটেও গিয়েছে নিরাময়।
নতুন ত্বকের স্তর প্রকৃতিই গজিয়ে দিয়েছে,
অর্থাৎ জীবন ঠিক এবম্বিধই তাও জানো।

চেতনা ডুবিয়ে-দেওয়া কোনো এক স্রোতের নিক্কণে
তরঙ্গিত হতে-হতে সম্পূর্ণ নিদ্রিত হয় মন।
তখনো বোধের তাল থাকে বোধ শান্ত পারাপার।
তেমনি এখনো বটে দেখা হয় তোমার-আমার।

২

অমিতাভ দাশগুপ্ত
আনন্দ বাগচী
আলোক সরকার
উৎপলকুমার বসু
কবিতা সিংহ
তারাপদ রায়
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নবনীতা দেব সেন
পার্থসারথি চৌধুরী
পূর্ণেন্দু পত্রী
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
মণীন্দ্র গুপ্ত
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুনীল বসু

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ভাষা

তোমার খোকন
তখনো শেখে নিবুলি।
মায়ের দুধের সাথে
মমতার পলি-মাখা শান্ত বর্ণমালা
তখনো শেখার মত খোকনের হয়নি সময়।

সে কেবল মেঘ-বৃষ্টি-রোদ দেখে
শব্দহীন তাকাতো অবাক,
তার দুই চোখে ছিল অরণ্যের নীল ছায়া,
নরম শরীরে
নতুন ফুলের গন্ধ,
দুই ছোট করতলে—মায়া।

এক মাঝরাতে
যখন আকাশ চিরে বজ্রের করাতে
ধা ধা অন্ধকার,
হঠাৎ 'মা' ডাকে মাগো!
শঙ্কায়, আনন্দে মুক উঠে বসেছিলে—
সেদিন তোমার
দু-ঠোঁটে ছিল না বুলি,
ছিল খোকনের।

আনন্দ বাগচী

এক বৃদ্ধ শিশুর কাহিনী

ছেলেটির সামনে খোলা পড়ে আছে জরদগব পাণ্ডুলিপি :
নির্বোধ পোকায়-কাটা ক্ষয়রুগ্ন ধূসর পৃথিবী
মরা আলো ঘিরে আছে নষ্ট চোখ, দুর্বোধ্য অক্ষর
আজ ওর চারপাশ ঝাপসা হিজিবিজি,
বিচূর্ণ গল্পের মত কিছু স্মৃতি, প্রিয় পরিচিত মুখগুলি
ভরেছে অ্যালবাম তার হলদে জ্বলে যাওয়া ফটোগ্রাফে।
বেলা যাচ্ছে দাঁতে, চোখে, চুলে, ভুলে
দুশ্চিন্তায় ঘোলাটে মগজে,
শৈশব বুকের মধ্যে, সামনে ছত্রাখান খেলাঘর
সামলে রাখা যাচ্ছেনা কিছুতে
জীয়ন্ত পুতুলগুলো ঘোরে ফেরে নানা হাতে ফেরা।

আলোক সরকার

মায়া

যা কিছু ব্যয় ক'রে ফেলেছি বলতে পারা যায় অপব্যয়
তা নিয়ে আমার কোনো ভাবনা নেই। আমার ভাবনা কেবল
এই সঞ্চয়গুলো নিয়ে। সঞ্চয় তো কম হলো না
হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলি। কোনটা কোন বাক্সে আছে!

আমার ভাবনা আসলে ব্যবহারের, হাতে সময় এতো কম!
কাল ঠিক বার করবো সবুজ পালক, ভাবি কাল ঠিক বার করবো
আর ভাবতে-না-ভাবতেই ওই ওই দেখো আসমানী রঙের মেঘ—
আমার সঞ্চয় আর একটা বাড়লো।

আর সকলে কেমন ক'রে ব্যবহার করে? একটা জীবন
তা তো আর কম সময় নয়।
হাত যেমন তেমন ক'রে পাতলেও হাত উপচে পড়ে উপহারে
প্রশ্নটা কেবল ওই ব্যবহারের, ব্যয় আর কতটুকু করা যায়।

মাঝে মাঝে ভাবি মাঠে গিয়ে উপুড় ক'রে দেব বাক্স
খুব হাওয়ার মাঠের মধ্যে কেমন উড়ে যাবে কুয়োতলার নিচের অন্ধকার
ব্যবহারে তো কোনোকিছুই লাগবে না। কিন্তু সেই যে রাতের জেগে থাকাটুকু
তাকে ছাড়তে বড় মায়া লাগে! এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে গুনুক ঠিক কটা বাক্স।

উৎপলকুমার বসু

একটি কবিতা

সতর্ক আমিও চাই আধখানা ডাল ভেঙে নিতে—কখনোই পুরো গাছ নয়।
ভাব ও নক্ষত্রপুঞ্জে উড়ন্ত কুড়াল তার বিঁধে আছে, অর্থাৎ কেশরী রয়েছে
এই বনে এবং আমরা আছি, ডাক্তার উকীল আছে, সেতুবিশেষজ্ঞ আছে,
কেশরীর ট্রাকখানি জলে ডোবা, কয়েকটি গোল কাঠ গড়ায় নালিতে,
ডাক্তার হাসছে এই চমৎকার সন্ধ্যায়, কর্মচারিণী শীতে উকীল হাসছে,
নদীর ওপারে গিয়ে আলো নাড়ে সেতুবিদ্, আমি হাঁকি : আধাআধি মাপো
অর্ধেক ব্রীজ টানো, অর্ধেক গাছ কাটো, পুরোপুরি কোনোটাই নয়।

কবিতা সিংহ

দ্যাখো

দ্যাখো এই চক্ষুহীন চলা
এই বাড়িয়ে দেওয়া হাত   এই তীব্র আঙুল
এ ভাবেই আঙুলের ডগায়
উঠে আসছে আছোঁয়া পৃথিবী
চোখ দিয়ে তো বহুবার হ'ল
এবার চোখ না দিয়ে !

দ্যাখো উল্টো করে বসিয়ে নিয়েছি নয়ন—
ভিতরে দীর্ঘ চলে যাচ্ছে পাকদণ্ডী
অনেক অতল অনেক উত্তল পেরিয়ে এই
                    অন্ধকারেরও আঁধার গুম্ফা

দেখা পৃথিবীকে ছুঁয়ে, না দেখা পৃথিবীকে দেখে
এখন আনন্দ
কেবলই আনন্দ রস ধারা।

তারাপদ রায়

গোয়াল ঘর

নিজের জন্যে একটা ঘরের কথা ভেবে
আমি একটা ঘরের ছবি এঁকে ফেললাম।
তার সামনে একটা গরুর ছবি আঁকলাম,
কিন্তু গরুটা আকারে ছোট হয়ে বাছুরের মত হয়ে গেলো।
তখন একটু বড় গরুও দিতে হলো,
সেটা হলো বাছুরের মা।
তারপর গরুর গলায় একটা দড়ি দিলাম,
যদিও দড়ি আঁকা খুব সোজা।
বাস্তবতার অজুহাতে বাছুরের গলায় দড়ি দিলাম না।
তারপর গরুবাছুরের জন্যে খড় ও খড়ের বালতি,
একটা ঘাসের আঁটি, কিছু ক্ষুদ কুঁড়ো,
এই সব যোগাড়-যন্ত্র করতে করতে
হঠাৎ বুঝতে পারলাম
আমার ঘরটা একটা গোয়ালঘরে পরিণত হয়েছে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অথয়া বটের নিচ দিয়ে

নিশুত আয়নার মতো জেগে আছো বিনিদ একাকী,
রাত্রি অবচয় কর দশ হাতে, দীয়ালি তারার
উজোর তলায় একা বেরিয়ে এসেছ—পূর্ণ হয়ে
ভরে ওঠা জগতের মাঝখানে। কেবলই লুকিয়ে
যাচো কেন তুমিও অমনি করে ভরে ওঠো যেন
জুঁইয়ের ঝারায় আভরণ হয়ে নাইতে নাইতে
স্নিগ্ধ সুহাগনী ডৌলটুকু বয়ে অথয়া বটের
নিচ দিয়ে হাঁটছ—ঘুমের সাঁকোও পার হয়ে গেলে…
এক দিন থেকে ফের আরেক দিন·· পবন বাঘিনী
নিশি ফুরোবার আগে বেড়ে আসে দিশপাশ ফুঁড়ে—
বটপত্রে পুঞ্জ হয়ে ঝরে পড়ে অপূরণ জ্বালা—
হাঁটু গেড়ে বসে হাত এড়ে তুমি বন্ধন করছ
নিজেকে—এতখানি পথ কেন এলে? উঠোনের পিঠে
ঝরকা আঁধার করে কেন রইলে না সারা জীবন?…
বটপত্রে পুঞ্জ হয়ে ঝরে পড়ে নিশুতি আঁধার…

নবনীতা দেব সেন

চলো বাতায়নে যাই

চলো, বাতায়নে যাই, মধ্যরাত্রি টোকা দিয়ে গেছে
বৃষ্টি এসে বার বার নাম ধরে দিয়ে গেছে ডাক
চলো, বাতায়নে যাই ছুঁয়ে আসি দিগন্তের হাত
এখন যেখানে ঝরছে একাকী বর্ষার মধ্যরাত।
না থাক সমুদ্র ঝাউ, নাই থাক মেঘগ্রস্ত চাঁদ
তবুও বাতাসে ভাসছে উন্মুখ, মুখর সংবাদ—
চলো বাতায়নে চলো বিজনবর্ষার মৃদুভাষ
আমাকেই ডাক দেয়, বুক ভরে অলৌকিক শ্বাস
নিয়ে আসবে, প্রসারিত অনন্তের হাত
ছোঁবে চলো, বাতায়নে ঝরে যায় দীর্ঘ মধ্যরাত

চলো বাতায়নে যাই বাল্যস্মৃতি টোকা দিয়ে গেছে
যৌবন গারদ ধরে নাড়া দিয়ে, দিয়ে গেছে হাঁক—
চলো বাতায়নে যাই চলো বাতায়নে যাই
চলো বাতায়নে যাই
চলো

পার্থসারথি চৌধুরী

আবহকালীন

সহজ সত্যের মতো লোকটি দাঁড়িয়ে—
কটিবাস, হলধর, আলোর বলয় আছে ঘিরে
অযত্নবর্ধিত চুল। তার অম্লান
শ্রমসাধ্য মাধুরীর উপাদানে গড়া।
এমন লোকের কাছে যাই,
দুদণ্ড কথাও বলি।
এতো ঝঞ্ঝা, ক্ষুব্ধ আহবের
মধ্যবর্তী শান্তি তার শরীরে আননে।
বঞ্চনা বুঝেছে তবু তিক্ততা রাখেনি,
এ কেমন যুগায়ত বোধ।
নির্মল জলের মতো মেয়েটি চলেছে—
সামান্য শাড়ির সঙ্গে অঙ্গের মিতালি,
শীর্ণ হাতে বিষণ্ণ বলয়
ভ্রূমধ্যে কুঙ্কুম।
তার কাছে যাই,
কথা বলি।
সহজ আত্মীয় যেন ডেকে নেয় কাছে,
জেনে নেয় ঘর-গৃহস্থালী,
কেমন চলছে সব,
কোন ঘরে কার স্নেহে কেমন আহ্লাদে
কেটেছে বয়েস।
সমস্ত মুগ্ধতা ভুলে আমি তার পদতলে
আনত নয়নে চেয়ে থাকি,
বিলাসের ফাঁস খসে পড়ে,
সামান্য আধারে ঝলে
পরমান্ন চারু।

পূর্ণেন্দু পত্রী

গনগনে আগুনের ভিতর দিয়ে

গনগনে আগুনের ভিতর দিয়ে আমাদের বাসরুট।

পিকাসোর ছবির মতো ক্ষতবিক্ষত ভাঙচুরে
আমরা জুড়ে গেছি পরস্পরের সঙ্গে।
বীভৎস অন্ধকার এবং নক্ষত্র-রাত্রির আলো
দুয়ের মাঝখানে কোনো বসার জায়গা না পেয়ে
আমরা বন্যার্তের মতো অল্প জায়গায় অনেক।
বাতাস যেন ডালপালাময় কোনো গাছ
এইভাবেই বাতাসকে জাপটিয়ে আমাদের হাত পা
নিশ্বাস, বিশ্বাস।

আর গনগনে আগুনের ভিতর দিয়ে আমাদের বাসরুট।

খালি চোখে রাহুতে পাওয়া সূর্যের দিকে তাকিয়েছিল যারা
আলোকস্তম্ভের খোঁজে,
তাদের রক্তাক্ত শহীদবেদীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমাদের
স্টপেজ।
যে-কোনো মহৎ ভাবনায় শরীর যখনই হয়ে ওঠে
আঠারো বছরের কুমারীর মতো কবিতাময়
গোপন সুড়ঙ্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলাৎকার।
সেই সব ফুঁপিয়ে-কান্নার গা ঘেঁসে ঘেঁসে আমাদের
স্টপেজ।

ভিতরটা বস্তীর ঝাঁটার চেয়ে নোংরা
নখ দাঁত খুনখারাপির খিদের ছুরির চেয়ে ধারালো
এমনি সব উলঙ্গ ষাঁড়
ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে যে-সব ল্যাম্পপোস্টের তলায়
তারই আশ-পাশ জুড়ে আমাদের
স্টপেজ।

আর গনগনে আগুনের ভিতর দিয়ে আমাদের বাসরুট।

আকাশের ছেঁড়া কাঁথায়
চিকেন পক্সের কাতরতা নিয়ে
শুয়ে আছে মেঘ।
গত দশ বছর ধরে বক্ষের গলায়
আলসার।
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে শ্যামল চাষাবাদের জন্যে
প্রস্তুত বৃষ্টিরা
হারিয়ে ফেলেছে তাদের নৈশ-অভিযানের মানচিত্র।
জল নেই
অথচ থকথকে কাদা
স্টপেজে স্টপেজে।
প্রয়োজন অথবা প্ররোচনা নেই
তবুও আক্রমণের তীর-ধনুক
স্টপেজে স্টপেজে।
স্টপেজে স্টপেজে এমন সব গর্ত এবং গহ্বর
এমন সব নিম্নগামী আদিম আমিষ খাদ
যার ফলে নিকটবর্তী গন্তব্য ক্রমাগতই রয়ে যায় নিশানাহীন
দূরত্বে।

আর আগুনের ভিতর দিয়েই আমাদের বাসরুট।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রেমের কবিতা

কার্তিকের অরুণোদয়ের মধ্যে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো।
পথের কাঙাল আমি, পথের ওপরে প'ড়ে থাকি।
তুমি চিরকুট দাও, আমি পড়ি, ধুলোর ভেতরে ফেলে দিই,
সহজে কোথায় তৃপ্তি ? লতাপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে চ'লে আসি।

এদিকে অনেক কিছু দেখা হ'লো। বিকেলে, পায়ের নিচে
ঘাস-মাটি শীত মনে হয়। ব্যায়ামনিরত ঐ বালকেরা
ঘনকুয়াশার মধ্যে বহুদিন-ধ'রে-চেনা পুতুলের মতো
হাত নাড়ে। আচ্ছন্ন, আতুর এই প্রকৃতির মধ্যে শব্দ হয়।

কার্তিকে, অপাপবিদ্ধ অরুণোদয়ের ফাঁকে, আবার তোমাকে
দেখা গেলো। তুমি এত কাছে ছিলে, বুঝতে পারিনি।
দু'এক মুহূর্ত দাও, আমার চপ্পল থেকে স্ট্র্যাপ খুলে গেছে।
পথের ভিখিরি আমি, পথেরই ওপরে খেলা হবে॥

মণীন্দ্র গুপ্ত

মায়া

বসন্তের শুরুতে যেই নিজের মধ্যে বাতাসের হাই তোলা টের পাই
অমনি সাবধান হয়ে যাই। ছোট, নিচু, অলক্ষ্য দেশ কোথায় আছে?
এখন সেখানে যাবার সময়।

খুঁজতে খুঁজতে একদিন পরিত্যক্ত ধানক্ষেতের জমি আবিষ্কার করি—
তখন খড়ের মূল মরে গেছে—শীতে, অকালবৃষ্টিতে এবং হু হু বাতাসে
ফেলে রাখা মাঠ শক্ত, দামাল আর বিজন। আর
গোপনে ঐ বিশাল প্রসার জুড়ে জেগে উঠছে মিনিয়েচারের জগৎ।
উবু হয়েও ভালো বোঝা যায় না, মাটিতে বুকে শুয়ে, মুঠোর উপরে

চিবুক রেখে দেখতে হয় সেই অণু নক্ষত্রের দেশ :

মাটির সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে শনিগ্রহের নীলাভ পাদপ—
তার বিন্দু বিন্দু বেগুনী ফুলে কী বিকিরণ ! মঙ্গলের লাল ঈষদচ্ছ
লতা তার তেজী হাত-পা ছড়িয়ে ছড়িয়ে মাকড়সার মতো
ফাটলে ফাটলে নেমে গেছে। রাত সবুজ পাতায় গাঁথা
ঐ যে কণা কণা বরফের ফুল
ও নিশ্চয়ই চন্দ্র-অংশী !

একটু দূরে, সরু ফাটলে জন্মেছে সোনার তারের মতো একগোছা ঘাস
যেন পাতালে ধরে নিয়ে যেতে যেতে এখানে এই জগতে ভেসে আছে
প্রসারপিনার লম্বা চুলের শেষাংশ।
ঠিকমতো ধরে ফেলতে পারলে সুন্দরীর সাদা শরীরটাকে
এখনো ফিরিয়ে আনা যায় !

গাছ-লতার ফাটলের অন্ধকারে আদিসুগন্ধ সাঁতরে বেড়ায়
কত কাজলকালো নিস্ক।

অণুবীক্ষণের মতো, দিনের পর দিন, এই সব দেখতে দেখতে
আমার সবুজ চোখ যেন পাতলা কালির মতো ছড়িয়ে
চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে থাকে মাঠে।

শেষে, একদিন যেমন ঘুরন্ত সিঁড়ি দিয়ে বাতাস উঠে এসে
টারেটে দাঁড়িয়েছিল, টের পাই, তেমনি আবার ঘুরন্ত সিঁড়ি দিয়েই সে
নেমে গেছে।

আকাশে নীল মেঘ দেখা দিয়েছে,
চাষীরা এবার ক্ষেত উলটে দেবে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অপ্রকৃত জড় ঘড়ি পিছনে লেগেছে···
যতো বলি থেমে থাকো, গর্জন করো না,
সাতটা-আটটা হয়ে থাকো, মিষ্টি হয়ে থাকো
তাহলে, পোশাক দেবো আসন্ন পূজোয় ।
চাঁদিপুর নিয়ে যাবো সমুদ্র দেখাতে
খানাপিনা ভালো দেবো, সুস্থ হয়ে থাকো,
দুষ্টুমি করো না, ঘড়ি, সন্ধ্যা হয়ে থাকো ।
রাত দ্বিপ্রহর হলে ওর ভয় করে
ওর দোষ ঢাকবো, গুণ গাবার শপথে
গ্রহণ করেছি ওকে, বিচ্যুত করো না ।
হোক না পুরনো পথ, পথের দক্ষিণে
ঐ বাড়িটিতে শান্তি-সমৃদ্ধিও রেখো ।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

স্টে্স ১২

তেত্রিশ বছর পার হয়ে গেল, না পেলাম চুনকামের গন্ধ, না পেলাম বারুদের। জানো শংকরপ্রসাদ, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড শিবু আর রঘুনাথ অসুখে ভুগে মারা গেল পরপর। ওদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে। নেই নেই করে কাচ্চাবাচ্চা হয়েছে অনেকগুলি। ফুটপাথ দিয়ে এখন হাঁটার উপায় নেই।

মোমবাতি জ্বেলে বসলে টপটপ ঝরে পড়ে অশ্রু। গৌরবময় ইতিহাস, খালি ট্রামের স্মৃতি। পাঁচফোড়নের গন্ধে মাকে মনে পড়ে যায়। প্রকাণ্ড রান্নাঘর, প্রকাণ্ড উঠোন।

ফ্রিডম ফাইটারদের কেউ-কেউ বেঁচে আছে এখনও। তাই এলাইসি কর্মী-মিছিলের-মুখে ঝুলছেন বঙ্কিমচন্দ্র। হাতে বোমা—বন্দেমাতরম, বুকে গুলি—বন্দেমাতরম। শংকরপ্রসাদ, ওদের ছবি হয়ে যেতে বলো। বয়স বাড়ছে। লোকজন বাড়ছে। হাতে অনেক কাজ। ঠাট্টা মসকরা ছেড়ে এবার নেমে পড়তে হবে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সনেট : কোনো সত্তজাতিকার জন্য

শিশু, এখনো তোমাকে ছুঁতে হয়না সাহস। দূরে
আরো কিছুকাল না লেখা শব্দের মতো দামী করে
রাখবো তোমায়। এখন তো তোমার শরীর জুড়ে
স্বর্গের শিকড়, ঈশ্বর প্রদেশে একলা একলা ঘুরে
হঠাৎ কি তোমার মনে হলো পৃথিবী এখনো বড়
সুন্দর পার্থিব! ধ্রুবতারকার পাশে অরুণার
সনির্বন্ধ আলো পথ দেখিয়ে এনেছে তোমাকে, আর
আমি জন্মকান্না শুনেই হেসেছি, হেসেছে আঁধারও!

এসো, একটু একটু করে কাছে এসো, আমাকে না ছোঁও
আমার ফুসফুসে যতো পৃথিবীর ধুলো পরাধীন
তাকে দুঃখ ভাসাবার ভাষা তুমি দাও আজ ঋণ,
শব্দের কপালে তুমি ঈশ্বরের ঈর্ষা ছোঁয়াও।
জন্ম এমন সুন্দর, জন্ম এতো প্রস্তুত কবিতা
আমার শৈশব তুমি, হে শিশু সূর্য-জ্যোতিষ্মিতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এখানে মানুষ নেই

এই নিস্তব্ধতা বড় তীক্ষ্ণ, যেন শব্দ ভেদী, যেন প্রেমহীন
মানুষের কাছাকাছি মানুষের বিকীরণ টের পাওয়া যায়
এখানে মানুষ নেই, আমি আছি, একা একা আমি কি মানুষ ?
রুক্ষ সমাজের থেকে এত বেশী নিশ্বাসের হাওয়া
আমাকে একলা নিতে হবে
সতেরো জনের খুশী হবার মতন পাখিদের ডাকাডাকি
আমার একার জন্ত !
এতদূর আকাশ সীমানা
অনায়াসে দুঃখী মানুষেরা মিলে ভাগ করে নিয়ে নেওয়া যেত
এত আলো, এত অন্ধকার

আমাকে বিপুল ধনী করে দেয়
এতখানি বিলাসিতা আমার সাজে না।

বৃদ্ধ চৌকিদার গেছে বরাকরে, রাতে সে ফিরবে না
আমার রাজত্বে আজ আমিই রাজা ও প্রজা, সঙ্গে আছে
দুটি হাত, দুটি পা ও কুড়িটি আঙুল
একুশটিও বলা যায়
তা ছাড়া অজস্র পক্ষপাত, রোমকূপ ছ'টি প্রিয় বন্ধু ইন্দ্রিয়
এবং ছ'রকম রিপু
তবু একাকিত্ব হয় সভাপতি, বাকি সব অস্পষ্ট নীরব
এমন নির্জনে আমি সহসা ভয়ার্ত হয়ে উঠি,
নিজেকেই ভয়, আর কাকে ?

এমন নিবিড় ভাবে নিজের সান্নিধ্যে চলে এসে
পাথরের বিশুদ্ধতা ভেঙে যায়, ভেঙে যায় নদীর গরিমা
কীর্তি মাথা নিচু করে
ভুল স্বর্গ নেমে আসে কাছে
এখানে মানুষ নেই, আমি আছি, একা একা আমি কি মানুষ ?
এই নোখ, এই দাঁত, দু'চোখের ঘোরানো-চাহনি……
এর চেয়ে স্মৃতি ভালো
নারীদের রূপ-রোমন্থন করা ভালো
অথবা উলঙ্গ হয়ে রাত্রি প্রকৃতির মধ্যে মিশে যাওয়া ভালো !

সুনীল বসু

শিল্প

যদি শিল্পের কাজ করতেই হয়, কারিগরি
তাহলে সবুজ গাছপালাকে সিঁদুরে লাল করে দাও
বসিয়ে দাও হলুদ পাখি, কালো পাখি
ফোয়ারার মতন গাছে
আকাশের নীল মুছে ধরাও গোলাপী আগুন
নারীর বুক খুলে বসিয়ে দাও জোড়া জোড়া পোর্সিলেন পিছল
পুরন্ত আপেল
কাকচক্ষুর মতন নদী, করো তাকে বার্গাণ্ডির মদের মতন
সোনালি তরল
পশমের বানাও গোলগাল বল হলুদ কালো ডোরা কাটা
যেন সতেজ বাঘের বাচ্চা
জল কন্যারা যেন মাছরাঙা রঙ শাড়ির বেয়াস
চুলে তাদের সুগন্ধী অন্ধকার
যদি কোনোদিন শিল্পের কাজ, কারু, মাথায় আসে
হৃৎপিণ্ডে বাজুক দামামা বাজুক ডুমদাম দ্রিমিক দ্রিমিক
অপ্সরীর গোছালো পায়ের নাচের, তালে তালে উড়ুক হাওয়াই ঘাগরা
রক্তে ঝিরঝির করে নামুক রোমাঞ্চের গুড়ো বৃষ্টি
হও সার্থক বা অসফল
পাকা রাস্তা ছেড়ে হাঁটো ঝোপঝাড়ে আগাছার জঙ্গলে
মাথা নীচে পা উপরে, পরো জোকারের আলখেল্লা
লোকে দিক গাল, বারুদ বিদ্রূপ, তুমি খোড়াই ডুমুর
হও স্বমেত গোঁথার পুরুষ
শিল্প তোমার পাখীর মতন নরম নারী
উল্টো ডিগি, ক্যাঙারু লাফ, থোড়াই তোয়াক্কা
শিল্প মানে ভাঙচুর কাঁচের মিনার, ঘণ্টাধ্বনি
ভূমিকম্প, হৃৎকম্প, জ্বর, উদাস দুঃখের জগৎ



অশোক চট্টোপাধ্যায়
উত্তম দাশ
কবিরুল ইসলাম
কালীকৃষ্ণ গুহ
কেদার ভাদুড়ী
গৌরাঙ্গ ভৌমিক
দাউদ হায়দার
দেবদাস আচার্য
দেবারতি মিত্র
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবী রায়
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
পরেশ মণ্ডল
পুষ্কর দাশগুপ্ত
প্রত্যুষ প্রসূন ঘোষ
বাসুদেব দেব

বিজয়া মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
মতি মুখোপাধ্যায়
মুকুল গুহ
মৃণাল বসুচৌধুরী
রত্নেশ্বর হাজরা
রবীন সুর
রমা ঘোষ
রাণা চট্টোপাধ্যায়
শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়
শান্তনু দাশ
সজল বন্দ্যোপাধ্যায়
সামসুল হক
সুরজিত ঘোষ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠা কি ?
কে চায় প্রতিষ্ঠা পেতে ?
দেবতা প্রতিষ্ঠা চায় না
দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়
জীবন প্রতিষ্ঠা পায় না
ফুলচন্দনমাখা ছবি প্রতিষ্ঠিত হয়

তাই যখনই কিছু গড়বে
তার ভিতটাকে ভেঙে দাও
যার ভিত আছে তা নড়াচড়া করে না
তাই যখনই কিছুর ছবি আঁকবে
তার চোখগুলো উপড়ে দাও
বুকে বড় বড় জানলা বসিয়ে দাও
আলো বাতাস আসবে
সব কিছু অনেক পরিষ্কার দেখা যাবে

প্রতিষ্ঠার দরকার নেই
প্রতিষ্ঠিতরা নড়াচড়া করে না

উত্তম দাশ

শুধু দেখা

এক একটা সময় আসে চমৎকার গল্পের মতো
যাকে কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না
কবিতার কিছু দুর্বোধ্য পঙ্‌ক্তি
যেমন আমাদের উত্তেজিত করে
নদীর মোহনার কাছাকাছি আমাদের সেই প্রতিক্রিয়া
এখানে নদী একটা বাঁক নেবে সামনে বিস্তার
সেই বিস্তার পেরিয়ে যাবার জন্য নয় শুধু দেখা
কি দেখায় নদী লবণ-গোলা জল দুপাড়ের অরণ্যে অযত্ন
অজানা ফুলের কিছু আনুমানিক গন্ধ
কিছু অদৃশ্য হরিণ কিংবা বাঘ
এই সব কিছু পেরিয়ে যাবার জন্য নয় শুধু দেখা

কবিতার কিছু দুর্বোধ্য উত্তেজনা
এক একটা সময় সঙ্গে নিয়ে আসে।

কবিরুল ইসলাম

চতুর্দশী

ও সব চলবে না আর নতজানু ক্ষমা চাইতে হবে
আমার যা-অপছন্দ চলবে না তা তোমার বাড়িতে
ত্যাখো হে, মাথার ব্যথা জ্বলে ওঠে অলীক আড়িতে
মানুষের দুঃখে কাঁদো! হয়তো ঠিক! এটা বুঝবে কবে?

একটি মানুষ পোড়ে, জানে না সে, অলৌকিক জ্বরে
সে প্রকার ভক্ত হলে দেখাতাম স্বীয় বুক চিরে
তোমার পতাকা যেথা বৈজয়ন্তী বসন্ত সমীরে
পরম ওষধি খোঁজে যে-মানুষ তোমার আদরে।

আমার অনেক ধান্দা শব্দে নাচে সাজানো সংসারে
হাজারো মানুষ তাতে যুক্ত হয় তোমারই সদগুণে
আমি উপলক্ষ মাত্র যে-রকম পান্তা মাখো নুনে
অথচ বোঝ না তুমি তাই দুঃখ বাজে হাড়ে-হাড়ে!

ভোট-রঙ্গে জামানত জব্দ হলে দ্বৈরথ রগড়ে
অগত্যা অসংখ্য মশা স্বপ্ন কাড়ে শত্রুর শহরে ॥

কালীকৃষ্ণ গুহ

আমাদের জন্য

এখন তোমার কথা মনেই পড়ে না, অথবা, সত্য এই, মাঝে মাঝে পড়ে।

সেরকমই আছো, নাকি এতোদিনে সন্তান-সম্ভবা হ'য়েছো যেমন হ'তে
এ-জীবনে চেয়েছো একবার?
কপালের চিহ্নটি কি আজো কেউ ঝুঁকে প'ড়ে ছাখে?

আমি খুব ভালো আছি, কিছুটা স্থবির আর ধুলো-ধূসারিত হ'য়ে আছি।

এ-শহর, লক্ষ্য করো, আমাদের জন্ম আজো এনে দিচ্ছে গ্রীষ্মকাল, স্নান,
টেরিলিন, স্মৃতির শূন্যতা।

কেদার ভাদুড়ী

সর্প মৈথুন

বন্ধ্যা সেই কেয়াগাছটার তলায়
জোড় বেঁধেছিলো দুটো সাপ।
ছেলেগুলো এলো লাঠিসোটা নিয়ে
মেয়েগুলো বললো : থাক্।
ব'লেই পাঁচজন পঞ্চমুখে ফুঁ দিলো   সুন্দর
বেজে উঠলো   শাঁখ।

বন্ধ্যা সেই কেয়াগাছটার তলায়
জোড় বেঁধেছিলো দুটো সাপ।
আর সেইদিনই শেষ রাত
চাঁদের থেকেও যে নিষ্পাপ
চাঁদের থেকেও সে নিষ্পাপ
ফুটফুটে এক ফুল
ফুল উঠলো ফুটে
জোড় খুললো   সাপ।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কৃষ্ণার জন্য গৃহ নির্মাণ

কৃষ্ণা আমার তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিয়েছিল এক গ্লাশ জল দিয়ে।
বললুম, 'দাও আরেক গ্লাশ।'

মাথার ওপরে বিশাল গাছ ডালপালাসমেত ছায়া হয়ে
তার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হত রোজ দুপুরবেলা।

আমিও ভূমিষ্ঠ হওয়ার ভঙ্গিতে তার জন্যে ঘর বানালুম, খাটপালঙ্ক,
রাস্তা থেকে দেয়াল তুলে একা হলুম, একা একা।

সে বলল, 'যাও, থাকব না তোমার ঘরে এমনতরো
ছায়াহারা, পর্দাঘেরা।'

বলে সে দৌড়ে চলে গেল রাস্তার দিকে।

কী আর করি? গোটা রাস্তাটাকেই ডেকে নিয়ে এলুম ঘরে।
বললুম, 'হল তো?'
'হল' বলে সে ঘুরতে লাগল আমার ঘরের ভেতরের রাস্তায়।

দাউদ হায়দার

এই মুহূর্তের কবিতা

১. যে আমাকে দুঃখ দিলো সে যেন আজ সুখেই থাকে—
—আমার বাঁধন-ছেঁড়া ভালোবাসা বেধেছিল দুর্বিপাকে।
আমি ছিলাম স্বেচ্ছাচারী আউল বাউল তীক্ষ্ণাধার
এক নিমেষে বাঁধলো আমায় কি জানি কি দুঃখ তার।

—যে আমাকে দুঃখ দিলো সে যেন আজ সুখেই থাকে।

২. দূর প্রান্তরে পড়ে আছে ঘর, গার্হস্থ্য-উৎসবে কবিতার
অরুন্ধতী করেছে পান বাংলাদেশী, শর্তহীন।
"আমাকে গ্রহণ করো, আমার দাহ্যতা";—ব'লে উড্ডীন
জটায়ু বিস্তার করেছে বাহু, অকুণ্ঠিত সমুদ্র-বাহার।

পরেশ মণ্ডল

ট্রাফিক জ্যাম

ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছি
শনিবার
ট্রাম বাস ঠেলা মিনি ট্যাক্সি রিক্সা লরি টেম্পো মটর
সারি সারি
পাশাপাশি
এঁকেবেঁকে
দোতলাবাসে আমি আমরা
ঝুলে বসে দাঁড়িয়ে অজস্র মানুষ
রাস্তায় ফুটপাতে মিছিল
মানুষ
গাড়ি
ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছি
রুমি ভাবছে মা বকবে
দীপু ভাবছে বাবা
আমি ভাবছি······
লোকটার কপালে ঘাম
মেয়েটার নাড়ি দ্রুত
ছেলেটা চঞ্চল
বুড়োটা পাথর
ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছি

পুষ্কর দাশগুপ্ত

মিস্টার কে প্রসঙ্গে

শ্রী বা শ্রীযুক্ত ক অথবা ক-বাবু বলিলে তিনি খুবই বিরক্ত হন ; অতএব তাঁহাকে মিস্টার কে বলাই বিধেয়। অবশ্য কে-সাব বলিলেও চলে। মিস্টার কে প্রসঙ্গে তাঁহার অসংখ্য সদগুণের আলোচনা অপরিহার্য।

প্রথমত, মিস্টার কে উচ্চ শিক্ষিত। কেননা তাঁহার বাড়ির আবালবৃদ্ধ সকলেই একমাত্র ইংরেজী বলেন। কেননা ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন এক অনবদ্য ভাষা ভৃত্যদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। কেননা তাঁহার বাড়ির কুকুর দুইটি বিলাত হইতে আমদানি করা। কেননা কুকুর দুইটির নাম

টমি ও ভিক। কেননা কুকুরের জন্য মিস্টার কে-র মাসে দেড় হাজার টাকা ব্যয় হয়। কেননা মিস্টার-কে গলফ্‌ ও টেনিস খেলেন। কেননা তাঁহার মুখে সর্বক্ষণ সুদৃশ্য বিলাতি পাইপ শোভা পায়। কেননা মিস্টার কে-র এক ছেলে ন্যু ইয়র্কে থাকে।

দ্বিতীয়ত, মিস্টার কে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত। কেননা কলিকাতার সাহেব পাড়ায় তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ি। কেননা তাঁহার বাড়ির সম্মুখে বিরাট লন। কেননা মিস্টার কে-র গাড়ি দুইটি ইম্‌পালা ও মের্সেডেজ। কেননা মিস্টার কে-র বাড়ি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। কেননা মিস্টার কে-র বড় মেয়ের দ্বিতীয় স্বামী সাহেব। কেননা আচার্য হরিদাস কলিকাতায় আসিলে চারজন শ্বেতাঙ্গী সাধন-সঙ্গিনীসহ একমাত্র মিস্টার কে-র গৃহেই অবস্থান করেন। কেননা মিস্টার কে-র বাড়িতে বিলাত হইতে আনীত টয়লেট পেপার ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয়ত, মিস্টার কে সমাজসেবী। কেননা মিস্টার কে অবসর পাইলেই দেশের কথা চিন্তা করেন। কেননা তিনি দুইটি পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির সভাপতি। কেননা কয়েকজন মন্ত্রী তাঁহাকে নিয়মিত ফোন করেন। কেননা মিসিস কে তিনটি মহিলা-সংঘের সভানেত্রী। কেননা মিস্টার কে বাড়িতে সপ্তাহে একটি ককটেল পার্টি দেন। কেননা সেই পার্টিতে একমাত্র আসল বিলাতি পানীয় পরিবেশন করা হয়। কেননা সমাজের গণ্যমান্যদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মিস্টার কে বিভিন্ন ক্যাবারেতে উপস্থিত থাকেন। কেননা বিদেশী দূতাবাসগুলির পার্টিতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হয়। কেননা মিস্টার কে-র বাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মাঝে মধ্যে বিলাত হইতে আনীত নীল ফিল্ম দেখানো হয়।

চতুর্থত, মিস্টার কে যথার্থ ভদ্রলোক। কেননা তিনি বছরে অন্তত একবার সপরিবারে য়ুরোপ বা স্টেটসে যান। কেননা মিস্টার কে-র বাড়ির কেহই কখনো ট্রামে, বাসে বা মিনিবাসে চড়েন নি। কেননা বহু সাহেব মিস্টার কে-এর বাড়িতে মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রিত হন। কেননা মিস্টার কে-র ছেলেমেয়েরা স্থ্য ম্যান, রেঙ্গলার বা লেওউস ৫০১ জিনস পরে। কেননা তাঁহার বাড়ির ব্যবহৃত জিনিসপত্রের শতকরা ৯৫ ভাগ বিলাতি। কেননা মিস্টার কে তাঁহার ড্রাইভার, কুক, মালি ও চাকরদের বেতন বছরে যথাক্রমে তিন, দুই, দেড় ও এক টাকা বাড়াইয়া দেন।

পঞ্চমত, মিস্টার কে অত্যন্ত ধার্মিক। মিস্টার কে-র মেজো ছেলে (বয়স ১৮) মেডিটেশনের জন্য গ্র্যাস স্মোক করে। কেননা মিস্টার কে-র মেজো মেয়ে (বয়স ২১) আচার্য হরিদাসের সামার ও উইণ্টার তান্ত্রিক চক্র-ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ করে। কেননা মিস্টার কে একটি কেনেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। কেননা আচার্য হরিদাসের পবিত্র জন্মদিনে মিস্টার ও মিসিস কে-র উদ্যোগে স্পিরিচ্যুয়াল ডান্সিং নাইট-এর আয়োজন করা হয়।

ষষ্ঠত, মিস্টার কে শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী। কেননা তাঁহার বাড়ির সকলে নিক কার্টার, হ্যারল্ড রবিন্স ইত্যাদি লেখকের নিয়মিত পাঠক। কেননা মিসিস কে প্রত্যহ একটি করিয়া মিল্‌স এণ্ড বুন্‌স্ গ্রন্থমালার বই পড়েন। কেননা মিস্টার কে স্যাটরডে টিটবিটস্ সহ পাঁচটি বিলাতি পত্রিকা কেনেন। কেননা কোণার্কের মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যের প্রতিকৃতি তাঁহার বাড়ির নানাস্থানে শোভা পায়। কেননা মিস্টার কে-র বাড়িতে পাশাপাশি রাখা মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য হরিদাসের বহুমূল্য পোর্ট্রেট দুইটি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধানো। কেননা প্রতিদিন সকালে মিস্টার কে এই ছবি দুইটির সামনে চোখ খুলিয়া ১ মিনিট, চোখ বুজিয়া ১½ মিনিট, অর্ধ নিমীলিত চোখে পৌনে ২ মিনিট মোট সওয়া ৪ মিনিট করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকেন।

বলাবাহুল্য মিস্টার কে সম্পর্কে অনেক কথাই বাকি থাকিয়া যায়।

দেবদাস আচার্য

সাদা কবিতা

হে বাতাস

আমাকে ওড়াও খানিক, আমি প্রাণ চাই, আমি
সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক নই, মানুষের অহংকার নিয়ে
প্রজ্ঞাহীন, পদস্খলনহীন বেঁচে থাকতে চাই, বেশ কিছু দিন

শয়তান বা ঈশ্বর কেউই এ পৃথিবীর রাজা নয়, আমি
নিজেই নিজের প্রভু, শিক্ষক
জানলাগুলি খুলে দাও, হে বাতাস
জানলাগুলি খুলে দাও
নিজেকে ভীষণ ভালোবাসি আমি : এই পাপ
পৃথিবীর হাওয়ায়, ধুলোয়, ঘাসে বিন্দু বিন্দু রেখে যেতে চাই
আর আমি কিছুই চাই না
সুদূর বাতাস তুমি বয়ে আনো কিশোরীর গান, গ্রামের ঢাকের শব্দ...

দেবারতি মিত্র

কিন্তু

বৃথা হয়ে যায় দুঃখ
বেদনার আশা এ শরতে
মরা মুখ দেখতে হবে তাই সাদা মেঘে চোখ ঢাকা
মনে পড়ে চৈত্র মাস
তখন কি স্বর্গে বাড়ি ছিল ?
বাগান বেতারযন্ত্র, কলম্বাস একটি শালিক।
মা ফলেষু না কখনো—উজ্জ্বল ধূসর ফল মাথাভর্তি।
তবে কেন শোক করি তবে কেন হাত ধরতে বলি ?
বিকলাঙ্গ বন্দুকের গুলি নিয়ে বুক তাক করে ছেলেখেলা—
কতটা জটিল পুঁজ জমে ধূর্ত হৃদয়ের ক্ষতে
তার মাপে কার লাভ ?
তবু সব পেতে চাই—ঘন ক্ষীর, পুরু বীজ
অথচ গেরুয়া নয় খোসাটি সবুজ হয়ে থাক।

ভুরু বুদ্ধ, উরু বেদ এমন মানুষ কেউ এসে
আমাকে অঙ্কুর দেবে
তবে আমি নীপফুলশ্যামা
সব ঋতু শুষে ফেলে জেগে যাব জীবনে প্রথম।
সূর্য চাই
চাই সেই সফলতা শুক্রের বাষ্পের মতো সাদা অপার কুহকম্লান
অস্থির দূরত্ব চাই, আর চাই
সপ্তর্ষির কোটি কোটি বছরের স্থানভ্রষ্ট মানচিত্র, অনাচার,
গতি।
আমি আর এক মৃতা : শ্যামদেশীয় যমজ
একসঙ্গে পাশাপাশি জুড়ে কিন্তু
এ জন্ম কাটিয়ে যেতে হবে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাদা পাঁচিল ভরে ঘুঁটে দিয়েছে কে
জ্বালানির এত মালমশলা কাদের কাজে লাগে।

সকাল সন্ধ্যা শুধু উনুন জ্বালানোর চেষ্টা
কাঠকুটো ও ঘুঁটের যত ধোঁয়া
কী যেন হয়েছে আজকাল
সব কিছুই বেশ ধোঁয়াটে মনে হয়

কে এসে কাল পাঁচিলে হাত রেখে
দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ ?
জানলার পাশে করবী গাছটার নিচে
কি একবার দাঁড়ায়নি ?
ধোঁয়া, শুধুই ধোঁয়া
অন্ধকার।   তাকেও এখন বেশ ধোঁয়াটে মনে হয়।

দেবী রায়

বয়স

বয়স আমরা ফুরিয়ে যাচ্ছি—বয়স
গোঁয়ার ষাঁড়ের রাগ, অপারগ—বয়স
ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে রক্তের উত্তাপ—বয়স

চাই সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকৃতির রোষ—বয়স
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে—বয়স

সকলি বয়সে করে হরণ করে—বয়স।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

উত্তুঙ্গ শিখরে তুমি বসে আছো ; আমাদের ক্রুদ্ধ কোলাহল
পৌঁছোতে পারে না ; প্রত্ন পৃথিবীর ঘুম হালকা মেঘের মতন ঘোরে ফেরে
তোমাকে আবৃত করে, তোমাকে আড়াল করে রাখে
মেঘ সরে গেলে দেখি নির্বিকার দেবতার পাথুরে মুখের শান্তি, আমাদের নও,
আমাদের নও, বড়ো দূরে আছো—এরকম চেয়েছিলে নাকি ?
এরকম চাওয়া কোনো মানুষের হতে পারে ? রক্তে ঘামে পিচ্ছিল মানুষ
তুমি ছিলে কোনোদিন, ট্রামে, ট্রেনে রক্তাক্ত হয়েছো ?
পা দানিতে পা রাখার প্রতিযোগিতার শেষে মাথা গলিয়েছো ? ভিড় বাসে ?

আমাদের কবিতায় মৃত্যু ও মড়ক থাকে, উৎকণ্ঠা আবেগ থাকে,
হা হুতাশ থাকে
জীবিতের যেরকম আশা ও বিক্ষোভ থাকে, ঘৃণা থাকে প্রতিহিংসা থাকে
আমাদের কবিতার ডানা নেই, খানাখন্দে হোঁচটে আঙুল
উড়ে যায়, দূরে থাকে উত্তুঙ্গ শিখর, ছেলেবেলা ওকে ছুঁয়ে দেবো বলে
ছুটেছি, তখনো তুমি ওই দূর তারাদের মেঘেদের শান্তি মেখে নিয়ে
শরীরে, গম্ভীর সুখে আত্মলীন দেবতার মতো
বসেছিলে, বসে আছো,
মুহ্যমান তুমি, তুমি দারুময়দৈব, উদাসীন
তোমার কবিতা অতি দামী পোষাকের মতো
ওয়াড্রোবে সাজিয়ে রেখেছি।

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

রাত্রিকে

ঘুমঘুম ঘরবাড়ি থেকে থেকে জানালায় আলোর চৌকো
বৃষ্টিধোয়া স্বচ্ছ রাস্তা
আবছা স্মৃতি দূরের শৈশব
মনের অতলে গোপন আলোর রশ্মি
জ্বলে নিভে যায়,
পায়ে চলা পথ যেন মৃদু নীচে নেমে আছে
পা হাঁটছে হাল্কা হাওয়ায় উথাল পাথাল
গভীর দীর্ঘশ্বাস অন্ধকারে পাশাপাশি
হাঁটে কতো কথাহীন কথা ঈথারে
গুল্মের মতো, আচমকা তাকালে
আলোর ঘূর্ণী সাত-সাতটা রঙ,

বাতাসে ধূলোর কণা ঘনিষ্ঠ সুদূর
ভেসে যাই যুগ্ম এক জলজ নৌকো

কিছুক্ষণ আগে কালবোশেখীর ঝড়ে ও
বর্ষণে ভিজে ওঠে উষ্ণ বালিয়াড়ি
ওই মুখ কেন এত বিষণ্ণ আতুর,
হাতের মধ্যে হাত ভীরু শিশু শালিখের
মতো কাঁপে কতো প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
মনে রেখো অঞ্জনা অতসী
আজ এই ভিজে হাওয়া নিলীম রাত্রিকে
মনে রেখো চিরদিন লিরিকে পয়ারে।
চারদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তারার বল্লম
ছুটে আসে, চৈতন্যহীন দেহ ভেসে যায়
হেডিস ছাড়িয়ে কোন্ দূর অলিম্পাসে।
মাটিতে টুকরো হয়ে খসে পড়ছে
চাঁদের চাঙড় কবির পাঁজর,
মস্তিষ্কের কোন্ কোষে ঘুরে চলে
বাঘের অন্তিম গান,
ইচ্ছে করে দূর শূন্যে, মহাশূন্যে মৃত্যুর অতলে
ওঠে নিয়ে তরল আগুন,
মাধ্যাকর্ষণের সুতো দাঁত দিয়ে কেটে দিই,
ডুবে যাই অচৈতন্যে, গহন নিবিড়ে।
আজকের রাত শুধু রাত্রি নয়, পূর্ণ
আলোকবর্ষ ব্যেপে যোজন যোজন
ছড়াই রংমশালের মতো আমারই সুন্দর।

বাসুদেব দেব

ফোয়ারার মত

ফোয়ারার মত উঠেছিল ঐ সাদা দুটি ঊরু
জ্যোৎস্না সাতারু সাদা পায়রার যুগল স্তবক
ঊর্ধ্ব উড়াল ভেঙে পড়া কিছু স্ফটিক সিঁড়ির
পিছল আড়ালে মধ্যরাতের কোজাগরী সুর
আমাদের মৃত সময়ের দুটি বিমূর্ত রূপ
নিচে পড়ে আছে করজোড়ে সেই বাচাল ঘড়িটি
ঐ তো আমার হেমন্ত দিন, চশমার নিচে
তোমার হাতের আঁকিবুকি কিছু উদাসীন হেলা

এদিকে শহর আলুথালু ভাঙে ভ্রান্ত ট্রাফিক
খোড়াখুড়ি আর পুরোনো পেরেক কাচের টুকরো
ভেঙে খানখান এপারে ধ্বান্ত বর্ণবহুল
মাঝখানে ঐ করাতের মত হিম নীল জল
ঝুলন্ত চাঁদ, তোমার নিষেধ কাগজের কুচি
পুড়ছে আমার দীর্ণ শরীর, ছেঁড়া কার্পাশ, ধূপ

কোথায়, রাঙা, সে হাতখানি তোর স্পর্শের ঝড়
সেই অঙ্গুরী ? ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালার পাশে
জীবন্ত হয়ে উঠেছে ক্রমশ ছুরি, ছাইদান, চাবি
ফোয়ারার মত উঠেছে ঊর্ধ্বে সাদা দুটি ঊরু

কোথায় লুকালি মরণ প্রবণ অনন্ত মৃগণাভি

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ফর্টি প্লাস

১. "সেল
বর্মাটিক বীমবরোগা জানালাদরোজা
টালী ইটালীয়ান মার্বেল পকমেল ইত্যাদী সস্তাদরে বিক্রি আছে",
সাইনবোর্ড। আছে ? থাকবে ? কিনব। বাড়ি বানাব।
তার আগে তফশিলী গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত চাকরিটা
পেয়ে যাই। ধরাধরি লাগে। ধরব। বার্মাটিক যেন ঠিক থাকে।
মার্বেল পকমেল রেডি। বাড়ি করব। বাগান
লালরঙের বেতের চেয়ার। ফুটফুটে......
২. কলিটিতে ঢুকলে বেআদব বুড়ো ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস্ মাপে চোখ দিয়ে
ট্রামের মেয়েরা, বসন্ত কেবিনের ছোকরারা সিঁথিটা দেখে নেয় প্রথমেই
আমি তো সেই চোদ্দ বছর আগে যেমন ছিলাম—
ফাটাপায়ে আলতা, পাকাচুলে সিঁদুর-পরা বুড়ি
চোখ দিয়ে বলে—আমাকে দেখ্। দেখলাম।
বুবু, তোমার কালোজামের মত মুখও হঠাৎ লাল হয়ে উঠত
আমি কি লক্ষ করি নি ? করেছি
কিন্তু ভালবাসা এক দুরূহ তত্ত্বের বিষয়—
দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বা ইনফ্লেশন বা জুডাইসম্ বা কোয়ান্টাম থিয়োরির মত।
তদুপরি ভালবাসার ত্বকে সহজিয়া মলম থাকায়
তার দুরূহতা মালুম হয় পরে,
যখন খুব দেরি হয়ে গেছে।

আমার দোষ ছিল না।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

কি ভাবে লেখা যায়

এসো, চুপ করে বসে থাকি আজ। জানলার বাইরে
কুঁজো হয়ে
মানুষ চলেছে কুঁজো মানুষের দিকে।
মেঘের আড়াল থেকে
বিরাট বিভ্রমকারী থাবা আবার এসেছে নেমে।
শুধু ত্যাখো,
ভালোমন্দ বলে না কিছুই—
পৃথিবী চৌচির হচ্ছে, পৃথিবী গুড়িয়ে যাচ্ছে, ভয়ে
ঠিকরে বেরিয়ে আসছে মৃত সন্তানের চোখ—
মনে রেখো, এসবের মাঝখানে বেঁচে থেকেছি আমরা

কিন্তু তাকে কি ভাবে যে লিখে রাখা যায়, কি ভাবে
কবিতা লেখা যায় এই নিয়ে।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

কবিতা শ্রমিকের জন্য

আমি বুঝি একজন কবিতা শ্রমিকের কষ্ট
প্রজাপতি হয়ে ওঠার দুঃখ
বেয়নেটের উপর রক্তের দাগ দেখে
একটি সুন্দর ফুল দেখা
রঙের কারসাজি
নানা ছলনার কারচুপি

কেউ কেউ ভালোবাসার ককুনের মধ্যে
তৈরী করে ফিনফিনে রেশম
যারা বেরিয়ে পড়ে
তাদের জন্য যুদ্ধ অসুখ
দাঙ্গা বিপর্যয়
এবং ট্র্যাফিকের লাল সিগন্যাল

ঠাকুমার কাছে প্রেম আর পূর্ণতার
গল্প শুনতে শুনতে
হৃদয় পানাডোবা পুকুর
কিছু নদীর শব্দ আসছে
সমুদ্রের
আমি বুঝি
প্রজাপতি হয়ে ওঠার দুঃখ

মতি মুখোপাধ্যায়

কবিতার ঘর

কুমোরে পোকার মতো কেবলি এই ওড়াউড়ি
কাদামাটি শব্দের তাল
নিরলস বয়ে আনা
ভূতগ্রস্তের মতো কাগজের দেয়ালে দেয়ালে
অক্লান্ত শ্রমের ঘর
আত্মসুখ সন্ধানে যা নয়
অবশ্যই আত্মজ কারণে।

কুমোরে পোকার মতো আত্মজ কবিতার জন্যে
এই ক্লান্তিহীন শিল্পকলা আমাদেব
রক্তাক্ত ক্ষরণ প্রতিদিন
প্রতিক্ষণই শ্রমের শিবির
গাঢ় অভিমান।

অথচ সে আত্মজেরা একদিন হৃদয়ে থাকে না
গুটি কেটে উড়ে যায় দূরে
পড়ে থাকে বিবর্ণ কাগজে
তার ঘর, শুকনো মাটির ঢেলা, স্মৃতি
মনে পড়ে একদিন
তরুণ হৃদয় ছেনে কিছু শব্দ
কাদামাটি শব্দের তাল
নিরলস বয়ে আনা
আমাদের ওড়াউড়ি আত্মজ কারণে।

মনে পড়ে একদিন
একদিন এইখানে কবিতার ঘর হয়েছিল।

মুকুল গুহ

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

১. অনেকদিন পরে আজ ভোর হয়, সেই ভোর যখন
তোমার কাছে হুদণ্ড বসার ইচ্ছে হয়, তোমার হাত,
ছুঁতে ইচ্ছে হয় একটু, আর তোমার অর্ধস্ফুট চোখে
হাজার চুম্বন বিস্ফোরিত হয়,
অনেকদিন পরে দু দুটো শালিখ চোখে পড়ে,
টবের রঙ্গন আরোতব লাল হয়ে ওঠে,
এবং দীর্ঘকাল আমি কবরে পাশ ফিরে ফিরে
ক্রমশ উদ্ভিদ হয়ে যাই।· ····তবু ভোর হয়।

২. পা জড়িয়ে বসেছে রোদ্দুর, ঈষৎ হেলানো শরীর,
মা পাখির মতন দুচোখ,
কাছে গিয়ে দেখেছি সেদিন। সেই চোখে নিস্তব্ধতা আছে,
হিংসা আছে কামনার স্তূপ আছে মিথ্যে নয়,
রেডিওতে গানরতা মেয়েটির জন্য, আর ওই রৌদ্রস্নাতা মেয়ে।
তাদের বুকের মধ্যে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়,
দুদণ্ড তাদের সঙ্গে কথা বলতে সাধ জাগে ভালবাসতে—

৩. জ্বলে যাক অধিকারবোধ, ছাই হোক—
পৃথিবীর সমস্ত কিশোরীকে একসাথে ভালবাসা যাক,
পৃথিবীর প্রত্যেকটি অন্তঃসত্ত্বা রমণীকে একসাথে ভালবাসা যাক।
বিনিময়ে নিয়ে যাক সর্ব অধিকার বোধ, বিনিময়ে
আমার যা কিছু নিয়ে আমাকে রেহাই দিক
সভ্যতার সাজানো অভিশাপ,
এ জন্মেই পুনর্জন্ম হোক—

মৃণাল বসুচৌধুরী

তোষকের স্বপ্ন নিয়ে

মুখ তোলো
এদিকে তাকাও
ছাখো
বুকের ভেতরে রুগ্ন হৃৎপিণ্ড
কি ভীষণ রক্তশূন্য
কেমন মন্থর
ছাখো
অসমসাহসী এই ইন্দ্রিয়ের খেলা
মমতামাখানো কাপ
ঘন দুধ
প্লেটভর্তি ভিটামিন
শিকড়ের কাছাকাছি
বৃষ্টিভেজা নারী
এদিকে তাকাও
ছাখো
তোষকের স্বপ্ন নিয়ে
উড়ে যায়
উদাসীন তুলো

রত্নেশ্বর হাজরা

অন্তত একবার

আমি দেখছি তোমার স্নানের জল বয়ে যাচ্ছে নদী দিয়ে
সেই জলে যৌন কাতরতা এবং জীবন কাতরতা
পাশাপাশি
দেখছি দু রঙের জল তোমার স্নানের পর বয়ে যাচ্ছে
সেই জলে নানারকম সংসর্গের গন্ধ ।
ভেসে যেতে দেখছি মহুয়াতলার বেহুঁশ মাদলের শব্দ
দেখছি পলাশ ডাঙার শস্যবিহীন মাঠ
আবার শহরে হৈহুল্লোড় ।
আমি দেখছি তোমার স্নানের পর বয়ে যাওয়া জল
যাতে পারাপার করে আমার খেয়া
আমি পার করি এবং পার হয়ে যাই ইচ্ছেমতো—
কিন্তু ঐ জল একদিনও তোমার প্রতিবিম্ব
বয়ে আনতে পারছে না কেন !
আমি একবার অন্তত তোমার প্রতিবিম্ব
দেখতে চেয়েছিলাম—

রবীন সুর

গাজন

যোগ্যতার উদ্বর্তনে কাকে খাবো ?
বরং নিজের রক্তে একা একা শুয়ে থাকা ভালো।
অহংকারে চন্দন গন্ধের উপশম
দেবতার (আছে নাকি ?) স্নিগ্ধ আশীর্বাদ।
ঘুম নেই কতোদিন রাত্রির আকাশে
নক্ষত্র কাঁটার বিছানায়
দুঃখগুলো
নিজের শরীরে বিঁধে
যতদূর অন্যকে নির্বিঘ্ন রাখা যায় !
ধিকিধিকি সন্তাপ একেলা,
ধুপের সৌগন্ধ্য চরাচরে
সান্ত্বনার মতো থাকে উদয়াস্ত অস্তোদয় পাশে।
চৈত্র শেষ
ক্ষমা নেই তামারঙ রোদ্দুরের তাতে।
পুনর্জন্ম চাই বলে
কেবল ঘুরপাক খাচ্ছি কষ্টের গাজনে।

রমা ঘোষ

স্বপ্ন

পাহাড়ের উড়ো ঘুম, নেমে আসে শুকনো পাতার রাশি সন…সন…সন…
ঢালু বাঁকে সরাইখানায় এক বসে বসে দেখি—
ভোরের বীজন বরফের গুঁড়ো মাখা নেমে আসে,
নেমে আসে আর্দ্র পালক কিছু, একটি বোতাম ডীপ গ্রীন,
তার স্টিল কালারের ট্রাউজার থেকে নেমে আসে ফিকে আলো
লিচুর শাঁসের হিম সাদা শীত রাত ধীরে ভেঙে।

একটু সকাল হলে ছুটে যাবে বাস গাড়ি, ছুটে যাবে হরেক মানুষ,
কেবল যাবো না আমি, বসে বসে তার কথা ভাবি—
যে থাকে পাহাড় দেশে, যার আছে আঙুরের ক্ষেত,
সে এক মায়াবী লোক আমাকে বোঝে নি কোনোদিন,
শুধু এক নিঝুম পিছল রাতে নিয়েছে সকল !
বাদাম গাছের কাছে শেষ হাত নেড়ে বলেছিল,—
তোমাকেও নিয়ে যাবো পাহাড়ের দেশে
যেখানে আমার বাড়ি যেখানে আবাদ।

এখনো আসেনি ফিরে, ডাকেনি তো প্রগলভ যুবা,
কী জানি তাদের আছে কটা মোষ কতগুলো ভেড়া !
কটা পীচ গাছ, আর কত বেশি ন্যাসপাতি ফলে,
মরিচ ফুলের ঢেউ কত শান্ত গ্রাম !
আমাকে বলেনি কিছু, শুধু বলে ছিলো,
তাদের পাখির নাম মেঘমালা,
তার নাম এখনও জানি না।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

তুমি লিখো

যে কবিতা এখনও লেখা হয়নি
তুমি লিখো
লিখো আমাদের শৈশবের বাতাবরণের দিনগুলি
কি রকম আমলকির গন্ধে কেটে গিয়েছিল,
কি রকম সুখে আকুলি বিকুলি ছিল নদীর স্রোত,
তুমি লিখো প্রভাতের বৃষ্টি ঝরা
অসুখের কথা
যখন মন বলতে ছিল এক অখণ্ড শিলাখণ্ড।

যে কবিতা এখনও লেখা হয়নি
তুমি লিখো.
লিখো আমাদের সাত বছর আগের
কলকাতা কাঁপানো ভালবাসার দিনগুলির কথা
যখন আমাদের সামনে ছিল
রঙিন কাগজের মোড়কে এইসব দিনগুলি
যা এখন যক্ষারোগিনী তরু দত্তের মুখের মতন
আকস্মিক হারিয়ে গেছে।

যে কবিতা এখনো লেখা হয়নি
তুমি লিখো
আমি ভালবাসতাম শাস্ত্রীয় সংগীত।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

ডাওহিলে একদা

শিখরে অরণ্য নয়, বর্শা-ফলকের মতো ক্রিপ্টোমেরিয়া জাপানীকা
গাছগুলি দীর্ঘ কালো, রহস্যজনক···দেখা যায় :
কাছে গেলে অন্য ছবি গভীর নিস্তব্ধ ছায়া, বনভূমি
প্রায়-অন্ধকারে
দুপুরে এনেছে সন্ধ্যা···তরল মেঘের স্রোত জনহীন পাহাড়ে সহসা।

এখন নিঃসঙ্গ শীত, উচ্ছল ভ্রমণে কেউ ডাওহিলে সহজে আসে না :
টয় রেল চলাচল করে কিছু অভ্যাসবশত নিচে কার্শিয়াঙ
বাজারের মধ্যরেখা ছুঁয়ে,
স্থানীয় জীবন দূরে পড়ে থাকে অল্টিচ্যুট ক'হাজার ফিটের আড়ালে
ক্রমশ বিরল লোকালয়ে।···

তারপর পরিচ্ছন্ন বনতলে ছায়া এই শীর্ষদেশে গোলাপী হলুদ
আলোর নিভৃত খেলা, কী শান্তি লুকিয়ে আছে ভেবে
একজন উঠে যায় বর্শা-ফলকের পাশে একা···

শান্তনু দাস

মা

সূর্য উপমা হয়ে আকাশের বুক-চিরে আসে,
নিজেকে মনস্ক চর্বিত সময়।
আধুনিক জামা জানে, চাঁদ মানে গ্রহ ছাড়া অন্য কিছু নয়,
অথচ কপালে সে-যে কতোবার টিপ দিয়ে গেছে।

কোন্ অভিমানে তুমি পূজোতে সাজো না কোনোদিন,
কাজললতায় ছুঁয়ে কালো-টিপ—স্মৃতি।
এত বড়ো হয়ে গেছি, অ্যাতো?
তোমার কোলের কাছে আমি আর ঘুমুতে পারি না।

মানুষ-ই পৃথিবী হয়।
জন্মলগ্নে একমাত্র পৃথিবী আমার।
অস্তিত্বেই বৃষ্টিপাত, রক্তক্ষরণ হয়ে যায়।
তোমাকে গরদ কিনে দেবো, কৌটো সিঁদুর,
আগুন-কাণ্ড-মেলা আগে, অন্ততঃ দেখে যাবো—
তুমি আজ আশ্চর্য সেজেছো।
বেড়াল ছানার মতো একবার প্রিয় কোল ছুঁয়ে যাবো ঠিক,

এর চেয়ে মনস্ক আমি কখনো হবো না।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসাবাদ

না—এ বাড়িতে থাকেন না
হ্যাঁ—ছিলেন
না—ফিরে আসবেন না
হ্যাঁ—রেখে গেছেন
বাহাত্তরটা পাইপ
তিনটে পাউচ
দোরগোড়ার ভিখিরি
হ্যাঁ—আরো কিছু
শ'চারেক বই
শ'তিনেক রেকর্ড
হ্যাঁ—আরো কিছু।
কয়েকটা খাতা
না—সাদা নয়
হ্যাঁ—কি সব হিজিবিজি কথা
না—আর কিছু নয়
হ্যাঁ—বলে গেছেন—
কথাগুলো মনে রাখতে
না—আর কিছু বলেননি
কিচ্ছু নয়
কিচ্ছু নয়

সামসুল হক

একিলিসের গোড়ালি

গাঁওবুড়োটা বলেছিলেন মাটি
পালিয়ে গেছে বরুণদেবের সঙ্গে
ছেলেপুলে ঠাঁই নিয়েছে নিত্য বাসুকির
পেটে এবং কেউ তার নিশ্বাসে

গাঁওবুড়োটা যুবায় ছিলেন জাবাল
কেননা নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি

গাঁওবুড়োটার নাতি-নাতনি তখন
হাসি দিয়ে বন্ধ করে হাওয়ার গুহার মুখ
তবু বিকেলবেলায় আসে দগ্ধপাথর পড়শি

এক ভিখিরিবালক ব'লে ওঠে
একিলিসের গোড়ালিটা সারিয়ে তুলি যদি
ওই সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে মাটি

স্বরজিৎ ঘোষ

বানানো

শহর এনেছি, এনেছি বানানো গ্রাম।
সকাল থেকেই জলের শব্দ ঘুরে গেছে কবিতায়
জানতে চেয়েছে এবারে কি বানালাম !

শরীরে গোপন ঋতু বদলের ছায়া
বয়ে বয়ে শেষে আমার কবিতা বারো বিলাসিনী সাজে
নিজেকে নিজেই ঠকিয়েছে, কী বেহায়া !

আঁকা শহরের ফুটপাতে, বোবা গ্রামে
যদিও নকল, তবু মাঝে মাঝে ভুল অভিসম্পাতে
বৃষ্টি ধারার মতন অসুখ নামে।

এবং ঠোঁটের কষ বেয়ে নামে লালা
বানানো দুঃখ সব মিথ্যের খড় কুটো জড়ো করে
স্বপ্নের বুকে ছুঁড়ে দেয় তার জ্বালা।

সেই সব দিনে যদি দেখা হয় প্রিয়
তোমাকে দেবই রক্ত সাক্ষী কিছু তাজা অক্ষর
তুমি তা যোগ্য অপমানে কিনে নিও।

৪

অচিন্ত্য নন্দী
অজয় সেন
অঞ্জন সেন
অনুরাধা মহাপাত্র
অমিতাভ গুপ্ত
অশোক পোদ্দার
ঈশ্বর ত্রিপাঠী
ঈশ্বর দত্ত
কমল চক্রবর্ত্তী
কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
জয় গোস্বামী
দীপক রায়
নির্মল বসাক
নির্মল হালদার

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
প্রদীপ চন্দ্র বসু
প্রবীর রায়
বীতশোক ভট্টাচার্য
বীরেন সাহা
মৃদুল দাশগুপ্ত
শম্ভু রক্ষিত
শ্যামল কান্তি দাশ
সমীর দে রায়
সুকুমার গরাণী
সুতপা সেনগুপ্ত
সুব্রত রুদ্র
সুব্রত সরকার
স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

অচিন্ত্য নন্দী

স্বর্গভ্রষ্ট

ঘুম ভেঙে গেলে দেখি একটা গভীর নীল মনিপুরী
চাদর দিয়ে আমাকে কেউ ঢেকে রেখে গেছে।
তখন ঠিক ভোর নয়, কারণ ইদানিং আমার ভোর বা
গোধূলি নেই, সীমারেখার দুধারে দাঁড়িয়ে রাত ও দিন।

সেই কবে থেকে ভেবে রেখেছি এই চাদর না ছিঁড়লে
আমার মুক্তি নেই, দাঁতে নখে ফর্দাফাই করেছি তাই।
তারপর স্বপ্নে তুমি নেই, শুধু সাপ আর কোকিলের মাংস।
দিন : মিনিবাসে মাথা হেঁট করে যাওয়ার মত অবমাননার।

দিন : পথের দুধারে কবন্ধ নারী পুরুষের মিছিলের।
(নাকি আমারই চোখ কেটে যায় বাসের ঘষা কাঁচে ?)
আমি সারাদিন শুয়ে থাকি শুয়ে থাকি, হৃদয়ের স্থানে
আমিই বসিয়েছি নিখুঁত পেস মেকার, ছিঁড়েছি যা

ভেবে দেখি সে কি মনিপুরী চাদর অথবা নীল আকাশ ?
আমার একমাত্র জানালা জুড়ে একটা মঞ্জরীসহ আমগাছ।
দিন রাত ভারি ভারি ট্রাক তাকে চুরমার করে যায়।
আমার অপলক চোখে খসে পড়ে পাতা ও মুকুল।

আমার জীবন ও আত্মহননের মাঝখানে ইলেকট্রনিক ঘড়ির
সংখ্যামালার মত নির্বিকার বদলে যায় আকাংখা ও যৌবন।
'আমি যীশুর হত্যাকারী' এই পাপবোধে একদিন ছিঁড়েছি
নীল আকাশ, আজ কোন্ মুখে তোমার সামনে দাঁড়াব ?

অজয় সেন

ব্যক্তিগত কবিতা

উন্‌আশী সালের মাঝামঝি সাময়িক থেমে গেল আমার কলম ও
এলোমেলো চলাফেরা
নষ্ট পত্রের ওপর জমে উঠলো ধুলোর পাহাড় আর
কব্জির সময় লজ্জায় ঝুলে রইলো, গলে গেলো মোমবাতি
ঘুমন্ত মানুষের হাতের মুঠোয় স্তব্ধ হয়ে এলো স্বপ্নাদ্য— ;
পাতাফুল ঝরিয়ে রুক্ষ গাছের ওপার থেকে নেমে এল
শীত ও কালো সন্ত্রাস
সমুদ্র বাতাস আবার উড়ে এল শহরের দিকে,
বিক্ষিপ্তভাবে রেডিওতে বাজলো শোকের গান
অনেকদিন বাদে আজ পর পর অনেক নামীদামী মানুষ মারা গেলেন ;
আমিও সকালবিকাল রাস্তায় ঘোরাঘুরি ছেড়ে |
ঘরের মধ্যে বসে থাকি দেওয়াল ঘড়ির মত থুম হয়ে
ভেসে আসে শুধু গমকলের শব্দ—
শব্দ করে ছুটে যাচ্ছে বাস, আরো শব্দ করে বাজে টিউকল—
আমি স্তব্ধ বসে থাকি ঘরের কোণে
শরীরময় গজিয়ে ওঠে ডালপালা
বাসা বাঁধে উই পোকা চোখের কোটরে
ক্রমশঃ ডুবে যাই অন্ধকারে—আরো অন্ধকারে ॥

অঞ্জন সেন

ছায়া-অবয়ব

(গান্ধার গুহায় হিউ-এন্-চাঙের বুদ্ধ ছায়া দর্শন

বিশাল গুহার মধ্যে তাঁহার ছায়া-অবয়ব ধরা,
ডাইনে আঁধার শূন্য বামে ;
সমাহিত পরিব্রাজক চক্ষু বোঁজেন।

পূর্বে আসাম, পাশে বঙ্গ,
মোরদাবাদ অল্প দূরে—বোধের অতীত—
খণ্ডতামুখী ভারতবর্ষ।
পোড়ো সংঘতে ছেঁড়া গৈরিক ওড়ে,
ভেঙে যাচ্ছে ধর্মাশোকের স্বপ্ন।

স্তব্ধ গুহা লোকগন্ধহীন,
সমাহিত মহাশ্রমণ চক্ষু মেলেন,
ভেসে ওঠে ' স্মিময় ভিক্ষা পাত্র !
কোন্ পটভূমি—ছায়া-অবয়ব ভাসবে ?

অনুরাধা মহাপাত্র

দূরবীণে বাংলাদেশ

কখন যে উঠে এল, দূরবীণে রহস্য প্রধান বাংলা, মাচানের প্রকৃতি জন্তুটি
টের পাইনি
কাঁধে ও কোমরে খেলা করে যে বৃশ্চিক চন্দ্রবিন্দু
তাকে ঠিক বনের ভেতরে দেখা পেট্রল, আকাশ ও যুদ্ধরত কালী
যাকে ঠিক বলে থাকো হাওরের মহানিমে ফুঁসে ওঠা স্তব্ধ ঈশানী

জলমন্ত্র কারও কারও শেখা থাকে, শ্রাবণের কাশি শুনে
প্রকৃতি কি মাথার উপরে চান যুদ্ধ বর্ডার, ছাদ হলে
ঠিকরে এসে ঝলসে দিত মুখ, পোড়া ভাঁটফুল
কাছে এসে রুইতন, হরতন কালো চুলের ফাঁকে দেখে নিলো
দুধখরিস অল্পকামড়লাগা মাঠের কোটরে
কোথায় সে বিদ্যুতে ওঠে চাক চাক জল, ডাঁসা মথ, বৃষ্টির বাংলাদেশ

দূরবীণে এর পরের বিশ্বটি দেখো রাস খুলে দিয়েছে ওপারে
চলাফেরা দেখে ঠিক প্লেনের মানুষ মনে হয়? মঙ্গল গ্রহের কেউ?
উলু দেয় ভিতর কামরায়, অশনি ও কেতুকে নিয়ে প্রতিভার খোঁজ নিতে
এ গ্রহে কি বিবাহের সম্পর্ক নতুন?
'বিচ্ছিন্নতাবোধ রাষ্ট্রে খুব শুভ নয়'
একথা শোনার পরে হাততালি দিয়ে উঠবে পেট্রল মানুষ!

দূরবীণ উল্টে দেখো জন্তুদের তাঁবু, তারপর কোটালের ভরটানে
পাঁচমাসে ঋতু ও নোঙর খোলে কাশিওঠা ঈশানের বউ!

অমিতাভ গুপ্ত

মানুষের মূর্তি

সূর্যের বিধ্বস্ত ছবি মনে পড়ে ? মনে পড়ে আমাদের সেই
দেখাশোনা ? প্রথম যেদিন ঘন আঠার মতন রক্ত ক্ষতমুখ দিয়ে

উপচে উঠে আমাদের শিশুর সারল্যে ভরা চোখ দুটি, কপালের তিল
ছুঁয়েছিল, সেদিনও পাইনি টের কত ক্ষয় কত ক্ষতি বাকি

ঝুঁকে পড়ে দেখেছি দিগন্ত শুধু বিস্ফারিত, পাখিরও ডানায়
অশুভচিহ্নের মতো সূর্যাস্তের কিছু আভা, কিছু অন্ধকার

সেইসব অন্ধকার কোলে টেনে নিয়ে তার ঘন কালো চুলে
রেখেছি সামান্য ঠোঁট—একটি চুম্বনে শুধু যত বেশি প্রতিবাদ থাকে

দিয়েছি, সহজ গল্পে ফাঁদ পেতে, যখন পৃথিবী ছিল উষ্ণ ও সবুজ
সেদিনের রূপকথা বলেছি যেমন করে মানুষেরা রূপকথা বলে

মনে পড়ে সেইসব ? যেদিন সমস্ত সূর্য ভেঙে ভেঙে ঝরে পড়ে গেল
মনে পড়ে, বলেছিলে, 'ভালো লাগে তোমার উদ্‌ভ্রান্ত মুখ, মনে হয়
ভালবাসা যায় ।'

অশোক পোদ্দার

মানুষটা ধুঁকছে

সর্বাঙ্গ দুঃখে ভিজে যাচ্ছে···
হাতের মুঠোয় কুঁকড়ে আছে ন্যালাখ্যাপা ভবিষ্যত।
চোখের সামনে মাইলের পর মাইল
বধির স্বপ্নের সড়ক।

উদ্বিগ্ন আতুর মানুষটাকে আঁকড়ে আছে
নাছোড়বান্দা দারিদ্র্য।
স্যাঁতসেঁতে অপরিচ্ছন্ন ঘরে
গুমরে মরছে সজীব আত্মা।
হাজার ঝামেলায় ঠকঠক করে কাঁপছে
নিরাপত্তাবোধ।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতে
রিক্ত মানুষটা ধুঁকছে···

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

গাছ

গাছের ছায়ায় গেছি একবার ছায়া সরে গেছে
গাছ নিয়ে কোনোদিন তাই স্তোত্রমালা রচনা করিনি
ছায়া সরে যায় রোদ সার্জেনের ছুরির মতন নয়
মস্তানের খাপ খোলা লোভের মতন রোদ
অধিকার করে নেয় খাওয়া শোয়া জেগে থাকা ঘুম
গাছ প্রায়শঃই আফ্রিকার ঝুরিনামা প্রাণীর স্বভাবে
সমস্ত জীবন রস শুষে নেয় নিয়ে চলে যায়
চলে যায় হাসাহাসি করে ভেঙে ফেলে ছড়িয়ে রাস্তায়
অর্জনের যোগ্য ছবি আমি পড়ে থাকি
একা বোকা অর্থহীন গাছ আমার রসদে বাড়ে
ছোটো থেকে চারা থেকে ডালপালা মেলে দশদিকে
বড়ো হয় ছায়াময় ছায়া দিতে পারে
দেয় না পালিয়ে যায় যেন রণপায়ে
দৌড়ে যায় দূরদেশে দিক চক্রবালের ওপারে
গাছের ছায়ায় গেছি একবার পুনরায় যেতে ভয় করে

ঈশ্বর দত্ত

বেঁচে থাকা

আমার রক্তের মধ্যে আজও খেলা করে অতীতের মানুষের মুখ
আঁকাবাঁকা পথ-ঘাট খাল-বিল পুকুরের শ্যাওলা সমেত
ভিজে শাড়ী কাঁখে ঘট ধীর গতি কিশোরীর নম্র পদপাত
আমার চোখের মধ্যে স্থির বিন্দু জমে থাকে জল
উঠে আসে ধীরে ধীরে শরতের সোহাগিনী চাঁদ

মাঠ ভেঙ্গে হি-হি করে ছুটে আসে পউষের হিম
শীতের কাঁপুনি নিয়ে ডাকে কোন আচাভূয়া, হাড়গিলে, বক
ঝিল্লীরা গান গায়, হেঁটে যায় ভিন্‌দেশী গ্রাম-গ্রামান্তর
লতা গুল্মে সারারাত জোনাকির ঝিকিমিকি দেখি উৎসব

সেই গ্রাম শান্ত নয় স্মৃতি নয় এখনও মুখর
আমার স্নায়ুতে তারা বহমান বারোমাস শিরায় শিরায়
সকল ঋতুতে ঘুমে স্বপ্নে জাগরণে
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে বয়সের দীঘল শরীর

কত কিছু বাসি হয়, বদলে যায় সমাজ সংসার
আমার গ্রামের ছবি প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে আজও নবীন
আশ্চর্য প্রেরণা দেয় ; দেখি তাই আঁধারে উজ্জ্বল
হৃদপিণ্ডে বসে আছে অচল অনড় এক মুগ্ধ প্রজাপতি।

কমল চক্রবর্তী

বিসকুট কারখানায় আগুন

নাইস বিসকুটের কারখানায় আজ আগুন লেগেছে
চকলেট বিসকুটের গা বেয়ে সন্ধ্যেবেলার আকাশ ছেয়ে গেল
এদিককার বাতাসে আজ প্রথম জামাইবাবুদের আসার কথা ঘোষণা করা হয়েছে·
আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতে পাব
পোড়া ট্রাই সাইকেল এবং ছেঁড়া জুতোর পাহাড়

শোবার ঘরের টেবিলে আর একদিনও ভাবতে পারিনি পুড়ে যাবার কথা
জানালা লাগোয়া খাট, আধশোয়া অবস্থায় দুটো একটা খবর আসে
অবনতির হতাশায় ভেঙে পড়ে যখন আটত্রিশ বছরের মহিলার স্তন

ভুলে যাবার সমস্যা খুব বেশী চুম্বন করতে দিতে হবে
বুঝিয়ে বলতে হবে বিস্কুট কারখানায় আমরা আগুন লাগাইনি
একই নম্বর দেখে হয়ত কেউ আশঙ্কা করবেন
সোনাদের ভয়ে সত্যি আজ বাইরে রাখিনি প্যাণ্ট-সার্ট
কি আশ্চর্য ! তবু বারবার পুড়ে যাচ্ছে বোকাদের কারখানার
নাইস বিসকুট।

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

আহ্বান

এখনো দুটি চোখের পাতা অসম্ভব ভারি
বিপর্যয়ে ঘুমে
এখনো সেই বটের শাখা প্রলয়-ঝুরি নামায়
কাঁকুড়ে মানভূমে
যখন সেই আঁধার-বটে জোনাই ভীড় করে
বাদুড়ে খেয়ে ছড়ায় বটফল
ছড়ানো কিছু নেবে না, তাই শূন্য হয়ে থাকে
সুখের সম্বল

নীলাঞ্জন, এবার তবে চোখের পাতা ছেয়ে
আষাঢ় আনো বটে
লম্ফগুলি নিভিয়ে দাও নিবিড় সংকটে

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দোসর

আরেকটি সন্তান দাও, এই বলে জেহাদ ধরেছো তুমি কতোরাতে
মিহিজ্যোৎস্নার সুতো মশারী পেরিয়ে এসে খেলা করে
তোমার ও মুখে সাবলীল
চিকমিক করে ওঠে উড়ু চুল,
ফিনফিনে হাওয়া এসে মশারীতে চিরুনী বোলায়
আর লুকোচুরী খেলে আলো ও ছায়া, মুখোমুখি হয় ফের,
শিশুটি ঘুমোয় অকাতর—;
বাইরে লাগাতার রৌপ্যপ্রপাত
ভেজায় ঘাসের ভেলভেট, পৃথিবীময় সবুজালি,
দেখি স্বপ্ন ফুটেছে ওই জোড়াদিঘীটির রক্তাম্বর নালফুলে.
এমন হাঁস চৈচৈ রাতে
তোমার ও দেবী প্রতিমার মতো মুখে কেবল জ্যোৎস্নার ঢেল খেল্ল
'ওর তো দোসর নেই খেলবার, ওই শিশুটির,' এমন ভেবেছি
আমিও,
তাই বিছানায় আধশোয়া হয়ে যতোদূর পারি
প্রসারিত করে দিই চেতনার শেষ বিন্দু আলো,
সারারাত স্বপ্নের খোঁজে চুঁড়ে ফেলি জোড়াদিঘী, নালবন.
শায়রের জল,
আরেকটি দোসর ফুল কোথায় রয়েছে ফুটে,
কোন সে নন্দনবনে—

জয় গোস্বামী

বন্ধুকে রাত্রির চিঠি

রোমশ জন্তুর মতো এসে বসে থাকি তোর ঘরে।
একদিন বল্লম এসে বিঁধেছিল শরীরে আমার—
তারপর, নিজেকে উপড়ে নিয়ে অন্য কোনো দেহের ভিতরে
বিদ্ধ হতে চলে গেছে। আজ এই ক্ষতস্থানে তার

ত্রিকোণ ফলার মুখ যেন ফিরে ফিরে আসে ডুবে যেতে মাংসের গরমে।
নির্জন জন্তুর মতো তোর ঘরে বসে থাকি, সারারাত্রি ক্ষরণ, ক্ষরণ···
একদিকে লতার দল ভিজে যায়, অন্যদিকে সেই ক্লেদ ক্রমে
ঝিনুকের মধ্যে গেলে বেড়ে ওঠে কোন বিষ? কার শিশু? সনাক্তকরণ

কখনো সম্ভব হবে? বোধ হয় না। আজ শুধু এসেছ বল্লম!
শরীর শিউরে তোলো—' অথচ ফলার গায়ে জিহ্বা ছোঁয়াতেই
লেগেছে লবণ জ্বালা ক্ষত মুখে। সে তবে আসে নি? তবে সে ওখানে নেই?
না-ই যদি এসে থাকে তাহলে আমার জিভ কেন এরকম

ফালাফালা হয়ে গেছে? কোন তীক্ষ্ণ ধারের আঘাতে?
বেঁধানো জন্তুর মতো তোর ঘরে বসে থাকি, ক্রমশ ক্ষরিত হয় বিষ···
অথচ আমার সামনে একা একা বসে তুই এখনো ভাবিস
আবার আসবেই কোনো বল্লম, ফলার মুখে আমাকে জাগাতে!

দীপক রায়

সে

বৃষ্টির মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে রোদ্দুরের মধ্যে সে আসে
বৃষ্টির মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে রোদ্দুরের মধ্যে সে আসে না

ছায়ার মধ্যে গন্ধের মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে সে আসে
ছায়ার মধ্যে গন্ধের মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে সে আসে না

সে আসে আর সে আসে না
দরজায় শব্দ হয়   শব্দ হয় না
          জানলার খড়খড়ি নড়ে ওঠে   নড়ে ওঠে না
পায়ের শব্দ   মেঝেতে   দেওয়ালে   ছাদে   কার্নিশে

সে আসে আর সে আসে না
শুধু রক্ত নিঃশব্দে চুঁইয়ে নামে
          পায়ের পাতা ভেজে   ভিজে যায়
রাত কত

নির্মল বসাক

পর্যটক

একটা সুতো ঝুলছে ওপর থেকে
শুধু একটা সুতো
তাই ধরেই খাঁড়া পাহাড়ে উঠছে পর্যটক
নিজের শরীর নিজেই তুলছে টেনে
নিচে সবুজ ঘন বন দুলছে   আকাশ দুলছে নীল
এই নির্জনতার আড্ডায় এই দীন-সেবক মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে

সারাদিন একটা বুক ঢাকা ওড়না
উড়ছে হাওয়ায়   এই বুঝি খসে পড়ছে রহস্য
এই বুঝি খসে পড়ছে দেহের নির্মোক
না শোনা হাততালিতে পাহাড় জোড়া যেন দুশ মজা

কে বলবে   এই যে ওপর দিক ওঠা   ওখানেই কী আছে সে
যার জন্য ঘাম ঝরে যাচ্ছে   যার জন্য মৃত্যুর সুতোতে
ধরে আছে জীবন   এই ঝুলন্ত ভারসাম্য পেরিয়ে
সে কী পৌঁছে যাবে ভ্রমণের শেষে   পাহাড়ের গুহা তাকে আশ্রয় দেবে
অরণ্য কী তাকে নেবে মেনে   নাকি নিচে অনন্ত আরাম
কান্ট্রি লিকার আর কান্ট্রি চিকেনে সেখানেই আসল ভোজ

কেউ জানে না   কেউ যেন শরীর ভিতর ঘণ্টা বাজায়
না সমস্ত অস্তিত্ব পেরিয়ে কোন দূরতম স্থান থেকে
উঠে আসে সেই প্লুত কণ্ঠস্বর
ঐ তন্তুর মধ্য থেকেই উঠে আসে নাকি তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ
কোন মন্ত্র না জেনেই নেচে ওঠে দুরন্ত মজ্জা
একটি মাত্র সুতো ছাড়া আর সব তার কাছে বায়বীয় মনে হয়
ঘর বাড়ী প্রিয় নারী পুজো পাট গাঢ় স্বর ছেড়ে
নির্ভার সুতোর মধ্যে সে ঝুলিয়ে দেয় শরীর

নির্মল হালদার

পুরণো

পুরণো এ জীবন আমাদের নয়
গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিলে এখনও জ্বালা করে
পুরণো এ জীবন আমাদের নয়
হাততালি দিলে হাড়ের শব্দ শুনি হাড়ের শব্দ শুনতে শুনতে
অমসৃণ জীবন
অমসৃণ জীবন আমাদের নয়
তোমার মুখ দেখলে শুকনো খড় দেখি
শুকনো খড আমাদের নয়
বাবাকে মনে পড়লে জড়োসড়ো একটা লোক দেখি
জড়োসড়ো জীবন আমাদের নয়
আঙুলে ছুঁচ ফোটালে এখনও রক্তের দেখা পাই
পুরনো এ রক্ত আমাদের নয়
আমরা গান গেয়ে ধান কেটেছি কাল
আমরা গান গেয়ে ধান কেটেছি আজ, এ বাদে
বাকী সব পুরণো
পুরণো এ জীবন আমাদের নয়

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

বিজ্ঞাপন

তুমি স্কুল শিক্ষয়িত্রী, আর আমি কেরানী কোথাও।
বাড়ি-ভাড়া দিয়ে
যে টাকা থাকবে তাতে মাসে চারটে দিন
শুধুমাত্র সিনেমা-ই যাওয়া যায়।

সিনেমা দেখতে যাবো, আর বিজ্ঞাপনে
বেবিফুড-কর্তৃপক্ষ আমাদের চমৎকার মোটাসোটা আহ্লাদী-আহ্লাদী
টলটলে চোখ আর টলটলে চলা
বাচ্চা দেখাবেন এক রীল ; কোত্থেকে জোগাড় করে ?
কাদের এখনো বাচ্চা হয় ? তারা কারা ?

হোটেলে খাওয়ার পর ফিরবো বাসায়—তুমি বলবে,
ঐ যে বাচ্চা, ঐ যে বিজ্ঞাপন, সত্যি আজকাল এতো
চমৎকার হয় !

প্রদীপচন্দ্র বসু

একটি মুহূর্ত একটি কবিতা

অনেক দিন পর তোমাদের রেলগাড়ী এসে থেমে গেল ইষ্টিশানে
দরজা খুলে ঝুপঝাপ নেমে এলে তোমরা—
তুমি, টুকু ও অনুভা
আরাম-চপ্পলে মেখে নিলে মোরামের লাল,
ভোর রাতে শিশিরের বুকে ফুটে উঠল কলকাতার জুঁই
দীর্ঘশ্বাস ফেলল উপোসী টিকিট চেকার
সন্তর্পণে হাতের নরম ছুঁয়ে নিল টিকিট, আর
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তোমাদের চলে যাওয়া,
লাফাতে লাফাতে চলে যাওয়া
এক্কাগাড়ীর পিছনে সায়া-শাড়ী গুটানো পায়ের সাদা ডিম···
হেসে উঠলে তোমরা
সাবান ঘষা চুলের ওপর নাচিয়ে তুলে শোলার টুপি ছড়িয়ে দিলে মুক্তো ;

অনেকদিন পর ঘুম কাতুরে শীতে জেগে উঠল হাজারিবাগ
ক্যানারি হিলের মাথায় ডেকে উঠল ট্যুরিষ্ট পাখী—
হাওয়া বদল ! হাওয়া বদল !

প্রদীপ রায়চৌধুরী

প্রচণ্ড খরা

বিশ্বাস হারিয়ে গেলে যন্ত্রণা হেঁটে আসে
অবিকল যেন ডেঁয়ো পিঁপড়ের সারি
সুউচ্চ মিনার থেকে ডেকে ওঠে চিলের তীক্ষ্ণতা
ভালোবাসা পুরোণ দেরাজে জমে যায় বিবর্ণ হলুদ
অবসন্ন বর্তমান চিরে ফেলে
সময়ের নির্দয়ী কুঠার

নিজস্বতা বলতে কিছু নেই ভূমিকার প্রশ্ন অবান্তর
তবুও জ্যৈষ্ঠের ভুখা মাটির মতো ফেটে যায় অবক্ষয়ী মন
প্রচণ্ড খরায় নরম বৃষ্টির স্বাদ যেমন ভুলে যায়
গঞ্জের চাষী
তেমনই স্রোতহীন বন্দরের নোঙরে আটকে থাকে
ভালোবাসার বিধ্বস্ত শরীর
রাশিচক্র ভেঙ্গে যায় সংসার সমাজ
বদলে যায় বেমালুম গল্পের শিল্পিত কাঠামো

তরুণ বীজের খুশি জীবনের উরুসন্ধি জুড়ে
এইভাবে পুড়ে যায় ভুল সর্গে অসম ঋতুতে
পুরোণ ছবির গায় যেমন কীটের দাঁত
ভুলে নেয় তরুণ সৌন্দর্য
তেমনই রুক্ষ সময় মুছে যায় দিনে দিনে ভালোবাসা
যৌবনের গোপন গরিমা

প্রবীর রায়

প্রিয় সম্পাদক

সাম্প্রতিক ভালুক সংখ্যার জন্য আপনার শ্রম
আমাদের জানিয়েছে তিনি মানুষ ছিলেন
(যদিও তার ফুলপ্যান্টের নীচে জুতোর ওপর
লুটিয়েছিল কালো লোমের ব্রাশ)

ভালুক পরিবারের ছবিতে
ওঃ কী স্বর্গীয় হাসি

কেবল লেখা ছিল না
ভালুকের মহুয়া বাগান
দু একটা মহুয়া ফলের কথা
যা আমরা আগে থেকেই জানি।

বীতশোক ভট্টাচার্য

মৃত্যু নয়

মৃত্যু নয় অন্ধকার দরজা-বাঁধা গাড়ি
মৃত্যু নয় উপড়ে-নেওয়া কুঁচকে-ওঠা ভুরু
মৃত্যু নয় আগলে খুলি দু'হাত আড়াআড়ি
মৃত্যু নয়

মৃত্যু নয় আঁজলা জলে সফর-সারা মাছ
মৃত্যু নয় ক'মাস ওমে তলিয়ে-থাকা ঘুম
মৃত্যু নয় একমাত্রিক ছায়ার কারুকাজ
মৃত্যু নয়

মৃত্যু নয় লৌকিকতা বিয়ের উপহার
মৃত্যু নয় জন্মতিথির আউড়ে-যাওয়া পুজো
মৃত্যু নয় বিজয়া সেই অশেষ ঢাক বাজার
মৃত্যু নয়

মৃত্যু নয় চওড়া সিঁথি সিঁদুরে ডগমগে
মৃত্যু নয় বাসি কাপড় ভোরবেলায় ছাড়া
মৃত্যু নয় দুপুরে ঘুম তুচ্ছে রাত জেগে
মৃত্যু নয়

মৃত্যু নয় আমি এবং মৃত্যু নয় তুমি
মৃত্যু নয় জেলখানার মতন খোলা দেশ
মৃত্যু নয় মরণে যাওয়া জীবন দুরখানী
মৃত্যু নয়

বীরেন সাহা

সেতুর ওধারে গোলাপ বৃক্ষ

কখনো কখনো ময়া জলে বৃষ্টি নামে
শুখা ভূমি থেকে একা প্রফুল্ল গোলাপ
তিরতির মেলে ধরে সুখের পাঁপড়ি
ভিজে ক্ষেত ছুঁয়ে রাখে হৃদয়ের তাপ।

গভীর দুঃখ থাকে তবু গোলাপের গাছে
পাঁপড়ি তো ঝরে যায় বৈশাখের ঘাসে
দুঃখ কাঁটা হয়ে বাজে গাছের শরীরে
চিরসঙ্গী কান্না ভাসে পূবান বাতাসে।

সেতুর ওধারে আহা এমনি গোলাপ বৃক্ষ
পুরাণো সড়কে তার মৌন প্রতিভাস
শ্মশান পেরিয়ে বিষণ্ণ পাখী ওড়ে
ক্যানভাসে লেগে থাকে নষ্ট আকাশ।

মৃদুল দাশগুপ্ত

রাত্রি

দুদিকে কামড় লাগা যে ফল কখনও তা গড়িয়ে যাবে না

পিছনের পথে আজ মোরগের পালক ছড়ানো

বলোনি স্বামীকে তবু ওষুধ খেয়েছো, কিন্তু শোনো

এতোদিন পরে কেউ এভাবে কাঁদে না

শম্ভু রক্ষিত

জিদ

ভূস্তরের কড়ি-অঞ্চলগুলিকে আমি জিঞ্জির করে চলি।
সংশয় : স্বয়ংক্রিয় বন্দুক ফিনকি দিয়ে আমার বাষ্প বের করে
আমার উদ্ভূত শিশু সওদাগরি ছকে ধমুর্ধর গোলক মোড়ে
আমার কর্মক্ষমতা কৃশ রাখার চেষ্টা করে

আমি, স্বধর্মে অধিষ্ঠিত মুনিব, পুরু করে মোমে মাজা
আমি, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, বড বড় পাথরের চাঙড়ের আয়তনের
আমি, নুড়ি পাথরের জলদস্যু, কোষাগারের চাওয়া-চাওয়ি নিয়ে পড়ি
আমি, ডানাওয়ালা ভাট, প্রগতি ও দুষমন টুপি পরি
আমি, ধোঁয়ায় তৈরি নীলচে-সবুজ রঙের লম্বা থাম
রকেট পরিচালনার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন
তার প্রায় সবগুলিই তৈরি করি

আমি, হাড়কঞ্জুষ একটা, মজুর শ্রেণীর লোক
আমার যতি স্ত্রী ভাজা ভাজা ধরণের ; কপিঞ্জলের মত তার মাথা
তার চোখের ভ্রূ-যুগল গুটান আর কবিলা, ঘন
আমি, সান্তর ঘৃণার বস্তু, দেড় টনের মত, শিঙের তৈরি হাতা থেকে
তৈরি করা শুরু করে করি হলোওয়ার কাচ
আমি, অন্ধকারে পোড়া শহীদ, নিজস্ব ধরণে বীরপুরুষ
আমি, মৎস্য শিকারের বর্ণনা ; উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত কাটা
গণিতশাস্ত্রী, আবিষ্কর্তা, রাজনীতিজ্ঞদের চতুষ্পার্শ ধরি

আমি, কাপালিয়া, এসো রিসার্চ কোম্পানির আন্দারে আসি
আমি, আমার শরীরের তরুণাস্থি অন্য ইস্পাতধর্ম শরীরে স্থাপন করি
আমি, বায়ুর চেয়ে ভারী অত্যুচ্চ বেগবান, এক নকশা হাতে ধরে
মাপজোখ টানি।
আমি, পাঁচ-ছ ফুট লম্বা হয়ে যাই।

শ্যামলকান্তি দাশ

আমার জীবন

আমার জীবন আমি কেটে ছিঁড়ে টুকরো করে
দশ হাতে ছড়িয়ে দিয়েছি
তুমি নাও ঘুণধরা হাড়মজ্জা,
তুমি নাও অন্ধকার মগজের ঘিলু
আর তুমি ? তুমি কি নেবে না কিছু ?
একা-গৌরী, কিছুই নেবে না ?
অন্ধকারে ডুবে যাবে চোখ !

তারপর আর কোনো ছবি নেই
প্রতিচ্ছবি নেই—
হঠাৎ জানালা দুটি একদিন হো হো শব্দে খুলে যাবে
চুপি চুপি উড়ে আসবে স্বপ্নের মতন কোনো লোক !

সমীর দে রায়

দু-এক পশলা বৃষ্টি

দু-এক পশলা বৃষ্টি এসে
মনে করিয়ে দিল যাওয়ার কথা

একটা পরবাসী কাক ছায়া খুঁজল
কার্ণিশে
আলসেতে ভিজতে থাকল
ভিজে যাওয়া শাড়ি,
টেবিলে বৃষ্টি-হাওয়ায় মাখামাখি
পড়ে রইল
কবিতা লেখার এলোমেলো কাগজ
তাকে লেখা চিঠি

এই অচেনা দুপুর,
বেঁচে থাকার নির্জনতা
আর
দু-এক পশলা বৃষ্টি
মনে করিয়ে দিল যাওয়ার কথা।

সুকুমার গরাণী

চাবি

দেখেছি অনেক মুখ—
কত ষোড়শীর আলোছায়া মাখা
কতদিন বহুদিন।

আয়নাটা গেছে, ভেঙে গেছে ঝড়ে
ছবি তবু ভাঙা নয়—
লালটিপ, ঝাঁত্তি, রঙিন আলতা—
দরজা খোলার চাবি।

আমি জানি, আমি জানি—
এই লালে দোলে বাসন্তী কিছু শাড়ি
সব দরজায়া এ ঘরে-ও ঘরে খোলে।

এ হৃদয় খোলে, কোথায় সে চাবি কই?

সুতপা সেনগুপ্ত

উত্তরেয়

গর্ভে যখন বিশাল ঘুমের পিণ্ড নড়ে
চমকে ওঠে ভিতর থেকে শহরতলি
ঝাউয়ের পাতায় চমকে ওঠে অন্ধকারে
হাত রাখা এক ছোট্ট মেয়ের কাচের চুড়ি

এই শহরে রোদ আসে না, আসমানও না
ফল বা বনের শস্য খাবার জন্য বেবুন
লাফিয়ে আসে সাগর, আসে ডিঙিয়ে পাহাড়
এখন, ওগো ছোট্ট মেয়ে, তোমার ক্ষিদে ?

গর্ভে বিশাল পিণ্ড নড়ে ঘুমের দেশে
রাত তো আজো ভোর হোলো না, দাঁড়াও ছাখো
ওই যে ছোট্ট মেয়ের হাতে ভাঙলো চুড়ি
ছোট্ট মেয়ের গর্ভে দোলে নতুন ক্ষিদে

সুব্রত রুদ্র

পিঁপড়ে

ক্ষুদে পিঁপড়ে, জিঁয়ে পিঁপড়েরা দল বেঁধে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে।
ঘুড়ঘুড়ে পিঁপড়ে একা একা ঘুরে বেড়াও
তোমার কি বন্ধু নেই ?

মেঘলাদিন, একা একা ঘুরে বেড়াও
ঘুড়ঘুড়ে পিঁপড়ে ?

সুব্রত সরকার

একটি গ্রামের কবিতা

আমার বোনের মত গমক্ষেত দাদা বলে ডেকে উঠেছিলো বিকেলে
এত বড় হয়ে গিয়েছিস খুকু তুই ?
থামালাম সাইকেল, টিউশানী বাড়ীতে আজ চা নেই
কপালে, রেললাইনের ওপারে ছেলের দল ফুটবল খেলে
চলে গেছে, শূন্য মাঠে তৃণেরা গভীর হয়ে উঠছে
বাড়ী ফিরছে মানুষ তার ক্লান্ত পদচ্ছাপে এসে পড়েছে জ্যোৎস্না
ফাল্গুনের বাতাসে কারা টর্চ মারো, মাথায় ব্যাণ্ডেজের মত
শাদা দালানের স্বপ্ন, আর আছে শাড়ীর আড়ালে
বাতাপি লেবুর ঠাণ্ডা, কচি স্তন, পাড়ার মেয়েরা
ছেলেদের মাথা খেতে নেমে আসে নার্শারীর মাঠে
যদিও রেডিওর গলা পাওয়া যায় তবু গ্রাম
পার্টি-অফিসের গায়ে চুল্লুর ঠেক, নদীতে স্মাগেল বোট
অনুপম প্লাটফর্মে ধানবেচা টেরিলিন চমকায় যুবক
যুবতীরা চাঁদের আলোয় মানুষ হয়েছেন এতদিন
আজ শাড়ী পান্টে কলেজে করছেন বাংলা সাহিত্যের ক্লাশ
কত বন্দুকের ডাক শোনা গেল, কত বুটের গর্জন
তবু কেন মানুষের মুখের অন্ধকারে ডুবে যায় মানুষের ঘর
মানুষের চোখের জলের চেয়ে আরও বেশী শিশির ঝরে রাতে
এই গাছপালা মুছে গিয়ে হ্রদ হবে, ঐখানে সিনেমা হাউস
তখন টিউবের জ্যোৎস্নায় বসে কবি একা লিখবেন
হেরিকেনের আলোর মত মানুষের সরলতা তাও একদিন
ধীরে ধীরে উঠে যাবে দেখো…

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

কবিতা

মানুষ জেনেছে নীলিমার ধ্যানমন্ত্র হৃদয়ের উত্তাপে
যূথবদ্ধ যন্ত্রণারও যুদ্ধময়তায়,
স্থবির মৃত্যুর চেয়ে জীবন মহান—
যেন শেষ বিকেলের দিগন্ত আপ্লুত লাল সন্ধ্যা,
যেন মসৃণ ঢেউ-তোলা রাত্রির নরম হলুদ বাঁকা চাঁদ !

এরই জন্যে মানুষের অলক্ষ্যে একটি প্রণাম, কী জ্বলন্ত প্রয়াস,
নদীর ওপরে ঝুঁকে থাকা অলস আকাশ চকিতে সৌন্দর্য আনে
বিষণ্ণ মানুষের চোখে ;

একখানা জলভরা মেঘের আকুলতা, হাওয়ায় ফুলের গন্ধ,
তার আশ্চর্য আভাসে মানুষেরা মধুমালঞ্চ মায়ায়
রঙীন চোখের রঙে প্রতিদিন মৃত্যুহীন অমল প্রাসাদ গড়ে,
গান গায়,—
মানুষের ছোট দীপশিখাটির কাছে এসে—মৃত্যুর অগ্নি শুধু
স্তব্ধ হোয়ে যায় !